জ্ঞান ও পবিত্রতায় ভাস্বর এক মহীয়সী

ড. ইয়াসির ক্বাদি

প্রকাশকের কথা

নবিজির সম্মানিতা স্ত্রীগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি মুসলিম উম্মাহর মা; উত্তম ও শ্রেষ্ঠ মা। একজন মা তাঁর সন্তানের নিকট ঠিক কেমন? নিঃসন্দেহে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। আমাদের সম্মানিতা মা আয়িশা (রা.) আমাদের শিক্ষক ও গাইড।

একটি হাদিস থেকে আমরা আয়িশা (রা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে জানতে পারি। আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'পুরুষদের মধ্যে অনেকে পূর্ণতা অর্জন করেছেন, তবে নারীদের মধ্যে পূর্ণতা অর্জন করেছেন কেবল মারইয়াম বিনতে ইমরান ও ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া। আর সব খাবারের মধ্যে সারিদ যেমন, তেমনি সব নারীদের মধ্যে আয়িশা শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।'
> বুখারি : ৩৪

আয়িশা (রা.) নারী সাহাবিদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এ ছাড়া বিচক্ষণতা ও সাহসিকতায়ও অনন্যা ছিলেন তিনি। আয়িশা (রা.) থেকে শরিয়াহর প্রায় এক-চতুর্থাংশ বিধিবিধান বর্ণিত হয়েছে। প্রখ্যাত সাহাবিরা যেকোনো সমাধানের জন্য আয়িশা (রা.)-এর কাছে আসতেন, পরামর্শ নিতেন। অনেক জমহুর সাহাবি মা আয়িশা (রা.)-এর ছাত্র ছিলেন। আবু মুসা আশআরি (রা.) বলেন—'আমরা রাসূল ﷺ-এর সাহাবিরা কোনো হাদিস নিয়ে সমস্যায় পড়লে আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করতাম। তাঁর কাছ থেকে তখন নতুন জ্ঞান লাভ করতাম।' প্রখ্যাত তাবেয়ি আতা বিন রাবাহ (রহ.) বলেন—'আয়িশা (রা.) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান, বিচক্ষণতা এবং সুন্দর মতামতের অধিকারী।' ফিকহ, চিকিৎসা, কবিতাসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ ছিল।

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সম্মানিতা স্ত্রীদের নিয়ে বাংলা ভাষায় বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শাইখ ড. ইয়াসির ক্বাদি ভিন্ন এক আঙ্গিকে তাঁদেরকে উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করেছেন Mothers of Believers নামের ভিডিও লেকচার সিরিজ। যেখানে তিনি মা আয়িশা (রা.) সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করেছেন। গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স পুরো লেকচার সিরিজ *বিশ্বাসীদের মা*

শিরোনামে প্রকাশ করেছে। সেখান থেকেই মা আয়িশা (রা.)-এর অংশটুকু আলাদা করে প্রকাশ করা হচ্ছে এখন। ক্বাদির বক্তব্যের সাথে প্রাসঙ্গিকভাবেই গার্ডিয়ানের প্রকাশিতব্য *আল মুহাদ্দিসাত* গ্রন্থের আয়িশা (রা.) সম্পর্কিত অংশও তুলে দেওয়া হয়েছে । এই সময়ে আলাপগুলো খুব জরুরি ও প্রাসঙ্গিক।

এখানের সকল বক্তব্য ও মতের ব্যাপারে আমরা ইয়াসির ক্বাদি ও আকরাম নদভির দৃষ্টিভঙ্গিই উপস্থাপন করেছি। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ বইটি অক্ষরের কালিতে পড়ার সময় অবশ্যই ভুলে যাবেন না—এটি একটি ভিডিও লেকচার।

নির্ভুল বই নির্মাণে আমরা সদা তৎপর; তবে কোনোভাবেই ত্রুটিমুক্ত করার দাবি করছি না। পুরো প্রক্রিয়ায় (বক্তব্য, অনুবাদ, বানান ও সম্পাদনায়) কোনো ত্রুটি হলে নিঃসন্দেহে আমাদের জানাবেন, প্লিজ! গার্ডিয়ান তার গ্রন্থসমূহ যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
২০ জুন, ২০২২

সূচিপত্র

আয়িশা বিনতে আবু বকর (রা.)-এর পরিচয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্ত্রী ছিলেন আয়িশা বিনতে আবু বকর (রা.)। আয়িশা (রা.)-এর ষষ্ঠ পুরুষ মুররা ইবনে কাবের সূত্রে নবিজির বংশধারার সাথে তাঁর বংশধারা মিলে যায়। ঠিক এভাবে—

আয়িশা বিনতে আবু বকর ইবনে উসমান ইবনে আম ইবনে কাব ইবনে সাদ ইবনে তামিম ইবনে মুররা ইবনে কাব।[১]

তাঁর মায়ের প্রকৃত নাম জানা যায় না। তবে জানা যায়, তাঁর মায়ের উপনাম ছিল উম্মে রুমান। অবশ্য অনেকে বলেছেন—তাঁর মায়ের নাম ছিল জয়নব। আবার কেউ কেউ বলেছেন—তাঁর মায়ের নাম ছিল দাদ। তিনি কুরাইশ বংশীয় ছিলেন না; ছিলেন কিনানা গোত্রভুক্ত।

আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর দুই অথবা তিনজন স্ত্রী ছিলেন। তার মধ্যে উম্মে রুমান (রা.) ছিলেন দ্বিতীয়। আবু বকর (রা.)-এর অপর স্ত্রী উম্মে আসমা ইসলাম গ্রহণ করতে না পারলেও উম্মে রুমান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আয়িশা (রা.)-এর দেওয়া তথ্যানুযায়ী—তাঁর পিতা-মাতা তাঁর জন্মের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'আমার জানামতে, তাঁরা ইতোমধ্যেই (আমার জন্মের পূর্বেই) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।'[২]

---

[১] إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع বৈরুত, ১ম সংস্করণ, খণ্ড-৬, পৃ.-৩৫

[২] বুখারি : ১/১৮১

সুতরাং আয়িশা (রা.)-এর বাবা-মা তখন পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। ফলে আয়িশা (রা.) মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি আরও বলেন—

> 'মক্কায় এমন কোনো দিন যায়নি, যেদিন নবিজি আমাদের বাড়ি ঘুরে যেতেন না।'[৩]

বুখারিতে উল্লেখ আছে, আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'যতদূর মনে পড়ে, একদিন আমার বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর বাড়ির সামনে মসজিদ নির্মাণ করবেন (সম্ভবত তখন আয়িশা রা.)-এর বয়স ছিল তিন-চার বছর। এখানে মসজিদ বলতে কোনো কিছু বিছিয়ে নামাজ আদায়ের স্থান বানানোর কথা বলা হয়েছে; কোনো স্থাপত্য নয়)। বাড়ির সামনের রাস্তার পাশের সে জায়গায় তিনি নামাজ পড়লেন এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করলেন। কুরাইশ নারী ও শিশুরা জড়ো হয়ে তাঁর নামাজ দেখতে থাকল। কুরআন শরিফ পড়ার অমায়িক সুর এবং আবু বকর (রা)-এর আবেগাপ্লুত কান্না দেখে তাঁরা আরও উৎসুক হয়ে উঠল। এর কিছুদিন পর তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করার চেষ্টা করেছিলেন, তবে তা সম্ভব হয়নি।'[৪]

যেহেতু এ ঘটনা আয়িশা (রা.)-এর বয়স তিন-চার বছর সময়ে ঘটে, তাই এ ঘটনা ততটা স্পষ্টভাবে তাঁর মনে ছিল না।

আয়িশা (রা.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন একজন মুসলিম হিসেবে। কারণ, আয়িশা (রা.)-এর মা উম্মে রুমান (রা.) তাঁর জন্মের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এখন প্রশ্ন জাগে, বিয়ের সময় আয়িশা (রা.)-এর বয়স কত ছিল?

বর্তমান সময়ে তাঁর বয়স নিয়ে বেশ বিতর্ক আছে। মূলত এটা কোনো বিষয়ই না। অযথা কুতর্ক। কারণ, পূর্ববর্তী জামানায় বয়স নিয়ে কোনো বিতর্ক ছিল না। তবে অনুমান করা যায়, বিয়ের সময় তিনি অল্পবয়সি তরুণী ছিলেন।

---

[৩] বুখারি : ২১৩৮

[৪] বুখারি : ৪৫৬, খণ্ড-২, পৃ.-২৮৪

বুখারি ও মুসলিমে তাঁর বরাতে বর্ণিত হয়েছে—

> 'যখন নবিজির সাথে আমার বিয়ে হয়, তখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর। আর নয় বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর আমরা একান্তে রাত্রিযাপন করি।'[৫]

আমরা অন্য যে সকল বক্তব্য শুনি, তা সবই এই বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়। তাহলে লোকেরা কেন অবিশ্বাস করে? আমরা সবাই জানি, তিনি মুসলিম হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন—এটাই বিতর্কের মূল কারণ! এ ছাড়া তো বিতর্ক থাকার কথা ছিল না। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা এক বা দুই শতক পেছনে ফিরে তাকালে দেখি যে, বিবাহে বয়সের এমন অপ্রত্যাশিত ব্যবধান নিয়ে কথাবার্তা বলা রাজনৈতিকভাবে কতটা স্পর্শকাতর।

একটি দল অবমাননাকর 'শব্দ' ব্যবহার করে কেবল নবিজি ও তাঁর স্ত্রীদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার জন্য। শ্রদ্ধাবশত আমরা সেসব শব্দ উল্লেখ করলাম না। কেবল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লোকরাই পারে এমন কুৎসা রটাতে এবং নেতিবাচক শব্দ প্রয়োগ করতে। বয়সের ব্যবধানের প্রশ্ন সামনে এনে তাঁরা এমনসব কথা বলার দুঃসাহস দেখায়, যা কখনো কাম্য নয়। তাদের ভাষ্য—এতে নাকি সমাজ ও সংস্কৃতিতে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল!

আবার অনেকে বলতে চেষ্টা করেন—আয়িশা (রা.)-এর বয়স বিয়ের সময় আরও বেশি ছিল। ঠাট্টা করে বলতে হয়—তারা কি এমনটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, বিয়ের সময় আয়িশা (রা.) ছিলেন ১৮-১৯ বছরের তরুণী? কাকতালীয়ভাবে এ যুগে এমনটা অনেকেই বলার চেষ্টা করেন। আমি এ মতের বিরুদ্ধে। তবে আমি যেকোনো সংশোধনবাদের (রিভিশনিজম) পক্ষে। রিভিশনিজম সর্বদা মন্দ নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। যদি অতীতে ফিরে যাওয়ার বাস্তব ও যথার্থ কারণ থাকে এবং কারও বক্তব্য পরিবর্তন করার সুযোগ থাকে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমার মতে, শুধু রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেতে কোনো প্রকার পরিবর্তন আনা অযৌক্তিক।

সুশীল সমাজ ন্যায়-অন্যায় যা-ই বলুক না কেন, তা কখনোই সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি হতে পারে না। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে তাদের ধ্যানধারণার সম্পূর্ণ

---

[৫] বুখারি : ৩৮৯৪; মুসলিম : ১৪২২

বিরোধিতা করতে হয়। আর ঠিক এ কারণে 'প্রোগ্রেসিভ ইসলাম' শব্দটা একদমই গ্রহণযোগ্য নয়। কোথা থেকে এসব শব্দ আবিষ্কার হয়, তা আল্লাহই ভালো জানেন! মূলত তাদের ইলম ও ইসলাম চর্চার কোনো শিরদাঁড়া নেই। তাদের মনঃপূত বিষয়গুলোকে তারা রাজনৈতিকভাবে শুদ্ধ এবং ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে (কিন্তু অন্যগুলোর ক্ষেত্রে তাদের মনোভাব উলটো)। এটা কীভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব?

তবে এটাও মনে রাখতে হবে, অতীতের পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে আমাদের গোঁড়ামি দেখানোর প্রয়োজন নেই। এটা অনুচিত। কারণ, সেই কল্পিত অতীত অনেক সময় সত্য নাও হতে পারে। তাই ভারসাম্যের প্রয়োজনে আমাদের কখনো কখনো পুনর্বিবেচনা করতে হবে। আমরা ভুল কোনো কিছু অন্ধের মতো লালন করার মতো জাতি নই। তবে আয়িশা (রা)-এর বিয়ের বয়সসংক্রান্ত সহিহ বর্ণনার বিরোধিতা গ্রহণযোগ্য নয়। আয়িশা (রা.)-এর জীবনী বর্ণনার ক্ষেত্রে মূল ফোকাস বজায় রাখার জন্য আমরা একটি উসুল মেনে চলব।

উসুল হলো—আমরা কীভাবে এ জাতীয় সমস্যাকে চিহ্নিত করব? সেইসঙ্গে এর বিশ্লেষণ ও সমাধানের মূলনীতি কী হবে?

তবে এ আলোচনায় শুরুতে ধরে নেওয়া যাক, আয়িশা (রা)-এর বয়স নিয়ে বর্ণিত সহিহ হাদিসের তথ্য নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই; বরং আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো, অতীতে কী ঘটেছিল।

ইসলামের সমগ্র ইতিহাসে মূলত এ নিয়ে কোনো বিতর্ক ছিল না। এমনকি কোনো বিপরীত মতামতও ছিল না। তবে বিগত ৫০ বছর ধরে আধুনিকতার নামে নানারকম ভ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা বিস্তৃত হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে অযথা মনোযোগ না দিয়ে আমরা সহিহ বুখারি ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে স্বয়ং আয়িশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসগুলো পর্যালোচনা করব।

আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'যখন নবিজির সাথে আমার বিয়ে হয়, তখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর, আর নয় বছর বয়সে আমরা একান্তে রাত্রিযাপন করি।'[৬]

---

[৬] বুখারি : ৩৮৯৪; মুসলিম : ১৪২২

এ হাদিস অনেক বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত, যা অবিশ্বাস করার কোনো সুযোগ নেই। এ হাদিসে সন্দেহ পোষণ করার অর্থ হলো, অন্য সব হাদিসে সন্দেহ পোষণ করার নামান্তর। কিন্তু কিছু মানুষ তা বুঝতে চায় না।

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়—আয়িশা (রা.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন মক্কায়; দাওয়াতি যুগে। দাওয়াত চলছিল বলে তাঁর বাবা-মা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এজন্য শৈশবের কোনো স্মৃতির প্রসঙ্গ এলে ইসলামি যুগের ঘটনাই তাঁর মনে পড়ে; পৌত্তলিক যুগের কোনো কিছু মনে পড়ে না।

অন্য এক হাদিসে তিনি বলেন—

> 'আমার অন্য কিছু তেমন মনে পড়ে না, তবে বাবা-মা মুসলিম ছিলেন এতটুকু মনে করতে পারি।'[৭]

অর্থাৎ, তিনি তাঁদের কেবল মুসলিম অবস্থাই দেখেছেন, অন্য কোনো অবস্থাতে নয়।

আয়িশা (রা.) আবু বকর (রা.)-এর কন্যা হওয়ায় তাঁর রহমত ও করুণার কিয়দাংশ তিনিও লাভ করেন। কারণ, মুসলিম হিসেবে জন্ম নেওয়া সন্তান তাঁর বাবা-মার রহমতের ভাগিদার।

একজন নারী হিসেবে তাঁর সৌন্দর্য ও দর্শনের ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত জানি না। কোনো বর্ণনাও পাওয়া যায় না এসব নিয়ে। তা ছাড়া তিনি আমাদের মা হওয়ায় এসব বর্ণনা করাটাও সমীচীন হবে না। তবে পরোক্ষ বর্ণনা ও ধারণার মাধ্যমে কিছুটা জানা যায়। হিজাবের বিধান আসার পূর্বে মুসলিম নরনারীরা একে অপরের চেহারা দেখতে পারতেন।

---

[৭] বুখারি : ১/১৮১

নবিজির সঙ্গে বিয়ে

মা আয়িশা (রা.)-এর বিয়ের ব্যাপারে আমরা কমবেশি জানি। তিনি নিজে বর্ণনা করেন—

> 'নবিজি আমাকে বলেন, বিয়ের পূর্বে আমি তোমাকে স্বপ্নে দুইবার দেখেছি। কেউ তোমাকে সিল্কের কাপড়ে ঢেকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। আর সে আমাকে বলছিল—"এ তোমার ভবিষ্যৎ স্ত্রী।" আমি কাপড় উত্তোলন করলাম, আর তোমাকে দেখলাম। তারপর স্থির করলাম, এ সিদ্ধান্ত যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে, তবে আমি তা বাস্তবায়ন করব।'[৮]

খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর রাসূল ﷺ এ স্বপ্ন দেখেছিলেন। জিবরাইল (আ.) আয়িশা (রা.)-কে সিল্কের কাপড়ে করে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। আবরণ অবমুক্ত করলে তিনি মা আয়িশা (রা.)-কে দেখতে পান। স্বপ্ন দেখে নবিজি নিজে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেননি। বলেছিলেন—'এ সিদ্ধান্ত যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে, তবে আমি তা বাস্তবায়ন করব।'

অর্থাৎ নবিজি ধারণা করেছিলেন, এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত। তবে তিনি এতে আবু বকর (রা.)-এর দ্বারস্থ হননি (হতে পারে তিনি অপ্রস্তুত ছিলেন তাই)। পরবর্তী সময়ে আল্লাহর ইচ্ছায় খাওলা বিনতে হাকিম (রা.)-এর মধ্যস্থতায় তাঁদের বিয়ে হয়।

---

[৮] বুখারি : ৩৬০৬

খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর খাওলা বিনতে হাকিম (রা.) নবিজির নিকট গিয়ে বলেন—

‘হে রাসূলুল্লাহ! আপনাকে দেখে বিষণ্ন ও নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। আপনি কি অন্য কাউকে বিয়ে করতে চান?’

‘তুমি কার কথা বলছ?’

‘যদি তালাকপ্রাপ্তা কোনো নারী হয়, তবে সাওদা (রা.)। আর যদি অবিবাহিত কোনো নারী কামনা করেন, তবে আয়িশা বিনতে আবু বকর (রা.)।’

নবিজি বললেন—‘যাও, উভয়ের সাথেই কথা বলো।’

অর্থাৎ তিনি উভয়ের ব্যাপারে সম্মত ছিলেন। অতঃপর খাওলা বিনতে হাকিম (রা.) যান আয়িশা (রা.)-এর মাতা উম্মে রুমান (রা.)-এর কাছে। তাঁর কাছে গিয়ে বলেন—

> ‘সুসংবাদ গ্রহণ করুন। নবিজি আয়িশাকে গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।’[৯]

এ কথা শুনে উম্মে রুমান (রা.) উৎফুল্লতা প্রকাশ করেন। এরপর তাঁরা উভয়ে আবু বকর (রা.)-এর নিকট গিয়ে আনন্দ সহকারে এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু আবু বকর (রা.) বলেন—‘তিনি কি আমার ভাই নন?’

আবু বকর (রা.)-এর এমনটা বলার কারণ হলো, নবিজি তাঁকে ‘ইয়া আখি’ বা ভাইজান বলে সম্বোধন করতেন। ফলে তিনি সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন। এরপর খাওলা (রা.) নবিজির কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বলেন।

তখন রাসূল ﷺ বলেন—

> ‘সে আমার মুসলিম ভাই, আমিও তাঁর মুসলিম ভাই। কিন্তু তাঁর কন্যা আমার জন্য হালাল। কেননা, সে আমার রক্তের সম্পর্কীয় ভাই নয়।’[১০]

---

[৯] المستدرك على الصحيحين, কিতাবুন নিকাহ, খণ্ড-২, পৃ.-৫১৮

[১০] বুখারি : ৫০৮১

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আবু বকর (রা.)-এর এটি না জানাই স্বাভাবিক। নবিজি তাঁকে সম্বোধন করতেন—'হে আমার ভাই!' আর এটা ছিল তাঁর মর্যাদার স্মারক।

অতঃপর খাওলা (রা.)-এর মাধ্যমে দেওয়া নবিজির প্রস্তাবে আবু বকর (রা.) অনেকটা রাজি হয়ে যান। তখন উম্মে রুমান (রা.) বলে ওঠেন—

> 'তুমি কি মুতইম ইবনে আদির সাথে প্রতিশ্রুত হওনি যে, তার পুত্র জোবায়েরের নিকট তোমার কন্যা বিয়ে দেবে?'

আয়িশা (রা.)-এর বিয়ে শিশু বয়সে ঠিক হয়ে গিয়েছিল মুতইম ইবনে আদির ছেলে জোবায়েরের সাথে (যেমনটি নবিজির কন্যার সাথে আবু লাহাবের ছেলের সম্বন্ধ হয়েছিল)। আর আবু বকর (রা.) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার মতো ব্যক্তি নন।

এক্ষেত্রে আবু বকর (রা.) আয়িশা (রা.)-কে জোবায়েরের নিকট বিয়ে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। এর মানে এই নয় যে, বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। যাহোক, এ বিষয়ে সমাধানের জন্য তিনি মুতইম ইবনে আদির বাড়িতে যান। তৎক্ষণাৎ মুতইমের স্ত্রী তাঁকে বলে বসেন—

> 'তুমি আমাদের তোমার ধর্মে রূপান্তর করতে চাও? তোমার কন্যাকে আমাদের কাছে এজন্য বিয়ে দিতে চাচ্ছ—যাতে সে আমাদের ধর্মান্তরিত করতে পারে?'[১১]

ফলে আবু বকর (রা.) বুঝতে পারলেন, তারা এ সম্বন্ধ সম্পন্ন করতে চায় না। সুতরাং নবিজির সাথে সম্বন্ধ করলে তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ হবে না। পরবর্তী সময়ে আবু বকর (রা.)-এর গৃহে নবিজি ও আয়িশা (রা.)-এর বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। তখন মা আয়িশা (রা.)-এর বয়স ছিল ছয় বা সাত বছর।

ইবনে হাজার (রহ.) বলেন—'আয়িশা (রা.) তখন ছয় বছর পেরিয়ে সাত বছর বয়সে পদার্পণ করেন।' সিরাতগ্রন্থসমূহেও এমন বক্তব্য পাওয়া যায়। এই বিয়ে সম্পন্ন হয় খাদিজা (রা.) ও সাওদা (রা.)-এর সাথে বিয়ের পর। অর্থাৎ আয়িশা (রা.) ছিলেন নবিজির তৃতীয় স্ত্রী।

---

১১ طبقات ابن سعد (৯:৮)

মতভেদের ব্যাপার হলো—তাঁদের বিয়ে কখন হয়েছিল? হিজরতের দেড় বছর আগে নাকি দুই বছর পরে? এটা নিশ্চিত যে, সাওদা (রা.)-এর বিয়ে খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকালের পরপরই হয়েছে। কিন্তু আয়িশা (রা.)-এর বিয়ে খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর বছরই নাকি পরবর্তী বছর হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে এ বিয়ে মক্কায় হলেও তাঁরা হিজরতের পর মদিনায় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সংসারজীবন শুরু করেন। আয়িশা (রা.)-এর ভাষ্যমতে—তাঁদের বিয়ের মোহরানা ছিল তৎকালীন ৫০ দিরহাম; যা নবিজির প্রত্যেক স্ত্রীর ক্ষেত্রেই সমান ছিল।[১২]

নবিজি কবে আয়িশা (রা.)-এর সাথে রাত্রিযাপন শুরু করেন, তা আয়িশা (রা.)-এর হিজরতসংক্রান্ত আলোচনায় পাওয়া যায়। তখন তাঁর বয়স ছিল আট বা নয় বছর। তিনি বর্ণনা করেন—

> 'মক্কায় রাসূলবিরোধী ষড়যন্ত্রে পরিস্থিতি উত্তপ্ত ছিল। এমন পরিস্থিতির মধ্যে নবিজি একদিন আমাদের দরজায় এসে কড়া নাড়েন। আমার পিতা আবু বকর নবিজির হিজরতের সঙ্গী হবেন—এ আনন্দে তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আমি এর পূর্বে তাঁকে কখনো এত উৎফুল্ল দেখিনি।'[১৩]

ধারণা করা হয়, আয়িশা (রা.) উম্মে আয়মান (রা.)-এর হিজরত কাফেলায় তাঁর সাথে হিজরত করছিলেন। তাবারানিসহ বেশ কয়েকটি গ্রন্থ আয়িশা (রা.)-এর সাথে ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'যখন কাফেলার উটসমূহ মদিনার পথে চলছিল, তখন আমি উটের পিঠে একা। উট উঁচু জায়গায় আরোহণ করতে গিয়ে গতি বাড়িয়ে দিলো। পেছন থেকে আমার মায়ের "আরিসা আরিসা" (অল্পবয়স্কা বধূ) বলে চিৎকার কখনো ভুলব না। কিন্তু আমি এক অদৃশ্য আওয়াজ (সম্ভবত ফেরেশতা) শুনতে পেলাম—"লাগাম শক্ত করে ধরো!" ফলে আমি তা শক্ত করে ধরলাম, আর উট কাফেলায় ফিরে এলো। মনে হচ্ছিল, কোনো পথনির্দেশক পথনির্দেশনা দিচ্ছিল। কারণ, আমি উট পরিচালনা করতে জানতাম না।'[১৪]

---

[১২] عن ابي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : كان صداق لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاً قال أتدري ما النَّشُّ . قال قلت لا قالت : نصف . মুসলিম : ১৪২৬

[১৩] বুখারি : ৩৯০৬

[১৪] বুখারি : ৩৯০৬

আমরা জানি, উট স্বনির্ভর ও জেদি প্রাণী। তাই এর দড়ি ধরে রাখতে হয়। হাদিসেও আছে—

> 'উটের মধ্যে মনিব থেকে পালিয়ে যাওয়ার স্বভাব আছে। কারণ, তারা খাদ্যে স্বনির্ভর।'[১৫]

মদিনায় পৌঁছে নবিজি আবু আইয়ুব আনসারি (রা.)-এর গৃহে কয়েক মাস অবস্থান করেন। তখন মসজিদে কুবা নির্মিত হচ্ছিল। নবিজির পাশাপাশি সাওদা (রা.) ও আয়িশা (রা.)-এর জন্যও পৃথক দুটি গৃহ নির্মাণ করা হয়। নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে আয়িশা (রা.)-এর গৃহে তাঁরা প্রথমবারের মতো একান্ত সময় পার করেন। সময়টা ছিল তখন প্রথম হিজরির শাওয়াল মাসে। অর্থাৎ হিজরতের সাত মাস পর। তাই আয়িশা (রা.) বলতেন—'আমার বিয়ে হয়েছে শাওয়াল মাসে। আর এ মাসেই আমরা একান্ত সময় কাটাই। আমার মতো সৌভাগ্যবান আর কোনো স্ত্রী কি হতে পেরেছে?'

জাহেলি যুগে শাওয়াল মাসকে বিয়ের জন্য কল্যাণকর মাস মনে করা হতো। আয়িশা (রা.) তাঁর আত্মীয়দেরও এ মাসে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তাই 'শাওয়ালে বিয়ে করা মুস্তাহাব কি না'—এ ব্যাপারে প্রাথমিক যুগের আলিমগণের মধ্যে মতভেদ ছিল। এই বিষয়ে ফয়সালা হলো, এটা জাহেলি যুগের প্রথা হলেও ঈমান-আকিদা পরিপন্থি না হওয়ায় এতে কোনো সমস্যা নেই।

আয়িশা (রা.)-এর বিয়ের সময়কাল সম্পর্কে কোনো কোনো ইতিহাসবিদ বলেন—'দ্বিতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে তাঁর বিয়ে হয়।' তবে ইবনে সাদ, ইবনে ইসহাকসহ অধিকাংশ আলিম বলেন—'প্রথম হিজরিতে তাঁদের বিয়ে হয়।' দ্বিতীয় মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা, এতে তাঁর বয়সের হিসাব ও বক্তব্যের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। যদি প্রথম মত গ্রহণ করা হয়, তবে মাঝের এক বছর সময়ের হিসাবে গরমিল হয়ে যায়।

আয়িশা (রা.) একটি হাদিসে তাঁর বিয়ের বিখ্যাত ঘটনা বর্ণনা করেন, যা বুখারি শরিফে উল্লিখিত হয়েছে—

> 'একদিন আমি বান্ধবীদের সাথে খেলছিলাম। তখন আমার মা আমাকে ডাকলেন। দৌড়ে আসায় আমি হাঁপাচ্ছিলাম। অতঃপর

---

[১৫] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قد تتوحش وتند من صاحبها

> মা আমাকে এক আনসারি মহিলার নিকট নিয়ে গেলেন; যিনি অন্যদের সাজিয়ে দেন। তাঁর গৃহে ঢুকতেই দেখলাম, কামরাভর্তি আনসারি মহিলাগণ আমাকে দেখে মুচকি হাসছেন। আমার জন্য দুআ করছেন। তখন একজন আমার চেহারা ধুয়ে দিতে শুরু করলেন। আরেকজন চুল আঁচড়ে দিতে লাগলেন, যেভাবে নববধূদের সাজানো হয়। এরপর আমাকে এক কামরায় নবিজির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। তখন ছিল সকালবেলা।'[১৬]

অবশ্যই আয়িশা (রা.) নিজ নিকাহের ব্যাপারে জানতেন। তবে হয়তো প্রকৃত দিনক্ষণ জানতেন না। আয়িশা (রা.)-এর বিয়ের বয়স এবং এতে তাঁর সম্মতি ছিল কি না—এ নিয়ে মাতামাতি করা আধুনিকতাবাদী সংবেদনশীলদের প্রতি আমাদের বক্তব্য হলো—

* প্রথমত, অন্য সমাজের সংস্কৃতি ও রেওয়াজ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক না।

* দ্বিতীয়ত, আয়িশা (রা.) তো কখনো এ বিষয়টি নিয়ে কোনো রকম আপত্তি করেননি, তাহলে আমাদের এত মাথাব্যথা কেন?

তা ছাড়া তিনি তাঁর দাম্পত্য জীবন উপভোগ করেছেন। তিনি ছিলেন ইতিহাসের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান নারী এবং একাধারে সৌভাগ্যবান স্ত্রী।

যুগে যুগে সংস্কৃতির ভিন্নতা থাকা খুব স্বাভাবিক। আর কেউ তো সপ্তম শতকের সংস্কৃতি বর্তমান সময়ে প্রয়োগ করতে বলে না। তাহলে তাঁর বিয়ের বয়স নিয়ে এত বিতর্ক তৈরি করা কোন ধরনের বুদ্ধিমত্তার কাজ?

আমরা মনে করতে পারি, কিশোরী মেয়েকে বিয়ে করা বর্তমান সমাজে অন্যায়। এমনটা আপনি মনে করতেই পারেন। তবে আপনি মানেন আর না মানেন, কিশোরী বয়সে বিয়ের মধ্যে কল্যাণ নিহিত। তার মানে আবার এই নয়, কিশোরী মেয়েকে বিয়ে করা আবশ্যক। মনে রাখতে হবে, সংস্কৃতি সময়ের আলোকে বদলায়। সমাজে প্রচলিত প্রথা তার অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি করে। বর্তমানে অনেক আলিম আমাদের বক্তব্য সমর্থন করেন। তবে অনেকে আবার ভিন্নমতও পোষণ করেন।

---

[১৬] বুখারি : ৩৮৯৪

সম্প্রতি এক দেশের শূরা কাউন্সিল বিয়ের জন্য ন্যূনতম ১৫ বছর বয়স বেঁধে দিয়েছে। যারা কিশোরী বয়সে বিয়েকে সমর্থন করেন, তাঁরা আয়িশা (রা.)-এর বিয়ের দলিল দেন। পক্ষান্তরে আপত্তিকারী লোকজন বলেন—'এটা তো সেই যুগের রেওয়াজ ছিল, বর্তমানে তা শরয়ি দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।'

জেনে রাখা ভালো, জৈবতাত্ত্বিকভাবে ও যৌক্তিকতার ভিত্তিতে নারীদের পরিপক্বতার সময় পরিবর্তন হয়। এটা দৃশ্যত নয়, তবে বোঝার ব্যাপার। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.)-এর বিয়ের পর তাঁর নয় বছর বয়সে নবিজি তাঁর সাথে একান্তে সময় কাটান। অবশ্যই তিনি পরিপক্ব ছিলেন—এটা তো অন্তত বোঝা যায়। তা ছাড়া ইসলামে বয়ঃসন্ধি (বালেগ কিংবা বালেগা) হওয়াই বিয়ের উপযুক্ততার নিদর্শন। বয়ঃসন্ধির ধরন যুগ থেকে যুগান্তরে, এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে ভিন্ন।

বর্তমানে একটি প্রচলিত শব্দ হলো—'কিশোর-কিশোরী'। এর দ্বারা কেউ পরিণত নাকি শিশু তা বোঝা দায়। বয়ঃসন্ধি পরিপক্বতার লক্ষণ। আর আয়িশা (রা.) ছিলেন পরিপক্ব। তাই এতে কোনো সমস্যা ছিল না।

সহিহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে উল্লিখিত আছে, আসমা (রা.) বলেন—

> 'আমি আয়িশা (রা.)-কে প্রস্তুত হতে সহায়তা করে নবিজিকে অনুরোধ করলাম তাঁর দিকে তাকাতে। নবিজি এসে তাঁর কাছে বসলেন। তখন নবিজি এক গ্লাস দুধের কিছুটা পান করে বাকিটা আয়িশা (রা.)-কে দিলেন। তবে আয়িশা (রা.) এতে লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে নিলেন। তিনি খুব লাজুক ছিলেন।'

আসমা (রা.) বলেন—

> 'তখন আমি তাঁকে খোঁচা দিয়ে বললাম—"নবিজির উপহার গ্রহণ করো ও পান করো।" অতঃপর আয়িশা (রা.) কিছুটা পান করলেন। নবিজি তাঁকে বললেন—"তোমার বান্ধবী আসমাকেও একটু দাও।" আসমা (রা.) পান করলে নবিজি তা অন্য নারীদেরও দিতে বলেন। তাঁরা বলল—"ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কোনো তৃষ্ণা নেই।" উত্তরে রাসূল ﷺ বলেন—"তৃষ্ণার কথা লুকিয়ে রেখো না। ক্ষুধার্ত হলে খাবার গ্রহণ করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। এটি তাকাল্লুফ (জোরাজুরি) নয়।"'

আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'আমার গৃহেই তাঁর সাথে প্রথম দেখা হয় (অর্থাৎ আয়িশা রা.-এর গৃহে নবিজি এসেছিলেন)। আমার বিয়েতে কোনো উট উপহার দেওয়া হয়নি এবং হয়নি কোনো দুম্বাও জবাই। তিনি আমাকে কেবল দুধ পান করতে দিয়েছিলেন।'

নবিজির বিয়ে এমনই সাদাসিধা ছিল। মাদানি যুগের প্রথম দিকে নবিজির সাধ্য এত বেশি ছিল না। সামর্থ্য থাকলে হয়তো পরবর্তী সময়ে ওয়ালিমা আয়োজন করা হতো। ইতিহাসের সবচেয়ে বরকতময় নিকাহ এমনই অনাড়ম্বরে হয়েছিল। যে দুধ উপহার দেওয়া হয়েছিল, তাও ছিল সাদ (রা.)-এর পক্ষ হতে।

বৈবাহিক জীবন

কিছু হাদিসে উল্লেখ আছে, বিয়ের পরও আয়িশা (রা.) তাঁর বান্ধবীদের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। সহিহ বুখারিতে এসেছে, আয়িশা (রা) বলেন—

> 'যখন নবিজি আমার সাথে দেখা করতে আসতেন, বান্ধবীরা তা লক্ষ করে ভয়ে পালিয়ে যেত। আর আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম।'[১৭]

অন্য এক বিখ্যাত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'একবার নবিজি আমাকে পুতুল নিয়ে খেলা করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—
> "কী এসব?"
> "ঘোড়া।"
> "ঘোড়ার এসব কী আবার?"
> "পাখনা।"
> "ঘোড়ার আবার পাখনা থাকে নাকি!"
> "সোলায়মান (আ.)-এর ঘোড়ার তো ছিল!"
> নবিজি এতে হেসে ফেললেন।'[১৮]

---

[১৭] বুখারি : ৬১৩০
[১৮] আবু দাউদ : ৪৯৩২

অন্য উম্মুল মুমিনিনদের তুলনায় অগ্রগামী

আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা অন্য সকল স্ত্রীর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যার চেয়ে বেশি। তন্মধ্যে অধিকাংশ হাদিসই রাসূল ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত। কয়েকটি হাদিসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, আয়িশা (রা.)-এর প্রতি নবিজির ভালোলাগা ছিল অন্য সকল স্ত্রীর চেয়ে বেশি।

অষ্টম হিজরিতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। তখন নবিজির সাত-আটজন স্ত্রী ছিলেন। আয়িশা (রা.)-এর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা শুধু স্ত্রীদের মধ্যেই সুবিদিত ছিল না; অন্যদের কাছেও ছিল। তখন কেউ কোনো অভিযোগ, উপঢৌকন বা চিঠি পাঠাতে চাইলে আগে খোঁজ নিয়ে জানতেন, রাসূল ﷺ কোন দিন আয়িশা (রা.)-এর গৃহে অবস্থান করবেন। সেদিনই তাঁরা নিজেদের ভৃত্যকে পাঠাতেন। এজন্য শুধু আয়িশা (রা.)-এর দিনে সকল অভিযোগ, উপঢৌকন ও চিঠি আসত। অন্যদের দিনে তেমন আসত না। তাঁর প্রতি নবিজির ভালোবাসা ছিল হৃদয়ের। তবে এই ভালোবাসা বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়—এমন কোনো কিছু তিনি করতেন না, যা নিয়ে অন্য স্ত্রীরা মন খারাপ করতে পারে। যেমন : নবিজি আয়িশা (রা.)-কে বেশি উপহার প্রদান করতেন না, তাঁর জন্য অধিক ব্যয় করতেন না ইত্যাদি। আর বাইরের লোকজনের চিঠি বা উপঢৌকন পাঠানোর ব্যাপারটি তো ভিন্ন। কারণ, এটা তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল না।

তাই একদিন অন্য স্ত্রীগণ নবিজির মেয়ে ফাতিমা (রা.)-কে সুপারিশকারী হিসেবে নবিজির নিকট পাঠালেন। ফাতিমা (রা.) এসে বললেন—

'আব্বা! আপনার অন্য সকল স্ত্রী আয়িশা (রা.) ও তাঁদের মধ্যে "আদল" চান।'

'তুমি কি জানো, কে আমার ভালোবাসা?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'তাহলে এই নারীকে ভালোবাসবে (আয়িশা রা.-এর দিকে ইঙ্গিত করে)।'

ফাতিমা (রা.) নবিজির অন্য স্ত্রীদের নিকট গিয়ে বললেন—'আমি ব্যাপারটি সমাধা করতে পারছি না।' ফাতিমা (রা.)-এর প্রচেষ্টায় তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁরা ধরে নিলেন, মেয়ে হিসেবে তাঁর বাবার প্রতি অধিক ভালোবাসা থাকায় তিনি হয়তো কার্যকর যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেননি। ফলে তাঁরা জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর দ্বারস্থ হলেন। তিনি ছিলেন অভিযোগ পেশ করার অধিক হকদার। কারণ, তিনি মর্যাদা ও ভালোবাসায় আয়িশা (রা.)-এর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

ফলে জয়নব (রা.) আয়িশা (রা.)-এর গৃহে গেলেন। তাঁকে দেখামাত্রই আয়িশা (রা.) কম্বলের নিচে নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন। অতঃপর জয়নব (রা.) একে একে তাঁদের সব অসন্তোষের বর্ণনা ব্যক্ত করতে লাগলেন। এদিকে কম্বলের ভেতর মা আয়িশা (রা.) ক্রমেই বেজার হতে লাগলেন। আশা করতে থাকলেন, নবিজি যেন তাঁর পক্ষে কথা বলেন। একপর্যায়ে নবিজি ও আয়িশা (রা.)-এর মধ্যে ইশারায় কথা আদান-প্রদান হলো। আয়িশা (রা.) ইশারায় জানতে চাইলেন, তিনি এ নিয়ে কিছু বলতে পারবেন কি না। নবিজি তাঁকে অনুমতি দিলেন।

অনুমতি পেয়ে আয়িশা (রা.) তাঁর ক্ষোভ এমনভাবে ঝাড়লেন যে, জয়নব (রা.) চুপ হয়ে গেলেন। তিনিও মনে মনে আশা করছিলেন, নবিজি যেন তাঁর পক্ষে কিছু বলেন। কিন্তু নবিজি শুধু বললেন—'সে হলো আবু বকরের কন্যা।'[১৯] এর দ্বারা বোঝা যায়—আবু বকর (রা.) বাগ্মী ও স্পষ্টভাষী ছিলেন। তাই তাঁর কন্যা আয়িশা (রা.)-ও তাঁর বাবার মতো স্পষ্টভাষী ও বাগ্মী।

ফলে জয়নব (রা.) ফিরে গিয়ে নবিজির অন্য স্ত্রীদের বললেন—'আমি কিছু করতে পারলাম না।' কিন্তু নবিজির স্ত্রীগণ তাঁদের দাবি প্রতিষ্ঠায় থেমে গেলেন না। তৃতীয় প্রচেষ্টায় তাঁরা অধিক বিচক্ষণ উম্মে সালামা (রা.)-কে পাঠালেন। প্রতি পদক্ষেপেই তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। প্রথমে নবিজির মেয়ে ফাতিমা (রা.)-কে পাঠিয়েছিলেন। এরপর জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-কে। আর সবশেষে বিচক্ষণ উম্মে সালামা (রা.)।

---

[১৯] বুখারি : ২৫৮১; মুসলিম ২৪৪২

উম্মে সালামা (রা.) নবিজির কাছে গিয়ে তাঁর যুক্তি উপস্থাপন করতে লাগলেন। এতক্ষণে নবিজি মুখ খুললেন। বললেন—

> 'আয়িশার ব্যাপারে তোমরা আমাকে বিরক্ত করো না। আল্লাহর শপথ! আমি যখন তাঁর সাহচর্যে থাকি, কেবল তখনই জিবরাইল ওহি নিয়ে হাজির হয়।'[২০]

সুতরাং আমরা বুঝতে পারছি, আয়িশা (রা.)-এর সাহচর্যের মাঝে আল্লাহর পক্ষ ফজিলত নিহিত ছিল।

উম্মে সালামা নবিজির অন্য স্ত্রীদের নিকট গিয়ে নবিজির শেষোক্ত জবাব পেশ করলেন। এটা শুনে তাঁরা সকলে চুপ হয়ে গেলেন। আর এ প্রসঙ্গেই উমর (রা.) (কন্যা হাফসা রা.-কে) বলেছিলেন—

> 'নবিজি বেজার হলে আল্লাহ তায়ালা যে অখুশি হতে পারেন, তুমি কি এতে উদ্‌বিগ্ন নও?'[২১]

বৈবাহিক জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ হলো মনোমালিন্য। এমন মানবীয় আচরণ নবিজি ও তাঁর স্ত্রীদের জীবনে কয়েকবার পরিলক্ষিত হয়। আর এগুলো প্রতিবারই মীমাংসা হয়েছিল উত্তমভাবে। নবিজির স্ত্রীগণের মানবীয় গুণ থাকায় এমনটা করা ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক। আর নবিজিও এখানে নিষ্কলুষ। নবিজি বলেছেন—'স্বয়ং আল্লাহ আয়িশাকে অনন্য সম্মান দিয়েছেন; আমি নই।'

উল্লেখ্য, নবিজির মানবীয় জীবনাচরণ সাহাবিরা জেনেছিলেন তাঁর স্ত্রীদের থেকে। তাঁরা এটাও বুঝতে পেরেছিলেন, এ মানবীয় আচরণ নবুয়তি মিশন থেকে ভিন্ন।

এখন নবিজি ও আয়িশা (রা.)-এর বৈবাহিক জীবনে ঘটে যাওয়া সুন্দর একটি ঘটনা আমরা তুলে ধরব—

একবার আবু বকর (রা.) তাঁদের বাড়িতে গেলেন। কোনো কারণে আয়িশা (রা.) তখন নবিজির প্রতি নাখোশ। তিনি ক্ষোভ সহকারে কথা বলতে বলতে একপর্যায়ে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছিলেন। ফলে আয়িশা (রা.)-এর প্রতি আবু বকর (রা.) রাগান্বিত হলেন। তিনি আয়িশা (রা.)-কে বললেন—'কত বড়ো স্পর্ধা! তুমি রাসূল ﷺ-এর সামনে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছ! নবিজির প্রতি ক্ষোভ ঝাড়ছ!'

---

[২০] বুখারি : ২৪৩৬, ৩৫৫৪

[২১] বুখারি : ৪৯১৩

একপর্যায়ে আবু বকর (রা.) মা আয়িশা (রা.)-এর ওপর হাত তুলতে উদ্যত হলেন। সাথে সাথে নবিজি আয়িশা (রা.)-কে রক্ষা করতে তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন। অথচ কিছুক্ষণ আগেই আয়িশা (রা.) তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলছিলেন! যেহেতু নবিজি রক্ষাকবচ হয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন, তাই আবু বকর (রা.) তাঁর হাত নামিয়ে নিলেন এবং মা আয়িশা (রা.)-এর প্রতি ক্ষোভ নিয়েই প্রস্থান করলেন। তিনি যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন নবিজি আয়িশা (রা.)-এর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—

'দেখলে! তোমাকে কীভাবে এই মানুষের হাত থেকে রক্ষা করলাম?'[২২]

এখানে নবিজি 'বাবা' না বলে 'এই মানুষ' বলে আয়িশা (রা.)-কে মজা করে আরও রাগিয়ে দিচ্ছিলেন।

এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, তিনি মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ। আল্লাহ তায়ালা চাইলে তো তাঁদের মাঝে কোনো বিবাদই হতো না! কিন্তু কেন এমন বিবাদ বা কথা কাটাকাটি হতো? কারণ, এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর অন্যান্য দম্পতিকে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। নবিজির জীবনাদর্শ ছাড়া এমন আদর্শিক শিক্ষা কোথায় পাব, আর কীভাবেই-বা শিখব!

বর্তমানে অনেক বিপথগামী দম্পতি তাদের দাম্পত্য মনোমালিন্যে কেবল সমস্যা খুঁজে বেড়ায়, বাস্তবতা বুঝতেই চায় না। আমাদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত, যেন কোনোভাবেই দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাস ও ভালোবাসার ঘাটতি দেখা না দেয়।

যাহোক, কিছুক্ষণ পর আবু বকর (রা.) ফিরে এলেন সমঝোতা করতে। সমঝোতা করতে এসে তিনি দেখলেন, তাঁরা গল্প করছেন, হাসি-ঠাট্টা করছেন, যেন কিছুই হয়নি। সদাচারী স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যেমনটা হয় আর কি! দুই-এক মিনিট মনোমালিন্য, পাঁচ-দশ মিনিট পর আবার উভয়ে স্বাভাবিক। তাজ্জব হয়ে আবু বকর (রা.) নবিজিকে বললেন—'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রশান্তির এ বলয়ে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করুন, ঠিক যেমন অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন কিছুক্ষণ আগের বিবাদে।'[২৩]

---

[২২] আবু দাউদ : ৪৯৯৯
[২৩] আবু দাউদ : ৪৯৯৯

সম্মান ও মর্যাদা

আমরা এখন আলোচনা করব আয়িশা (রা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে। এ জন্য নিচে কিছু পয়েন্ট তুলে ধরছি। এর মাধ্যমে জানতে পারব, আমাদের আম্মাজান আয়িশা (রা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা কতটুকু।

ক. সকল পুরুষ ও মহিলা সাহাবির মধ্যে মা আয়িশা (রা.) ছিলেন দ্বিতীয় সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী। আবু হুরায়রা (রা.) সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী। হাদিসের এমন কোনো কিতাব পাওয়া যাবে না, যেখানে আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদিস নেই। তিনি ২২০০-এর অধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ১৭৪টি হাদিস 'মুত্তাফাকুন আলাইহি'।

খ. বিখ্যাত সাহাবি আবু মুসা আল আশআরি (রা.) বলেন—

> 'যখনই কোনো সাহাবির হাদিসের মর্মার্থ বুঝতে সমস্যা দেখা দিত, আমরা মা আয়িশার কাছে চলে যেতাম। তখন তিনি তা খোলাসা করে দিতেন।'[২৪]

ইবনে শিহাব জুহরি (রহ.) বলেন—

> 'মা আয়িশার জ্ঞান যদি এক পাল্লায় রাখা হতো, আর অন্য সকল স্ত্রীর জ্ঞান আরেক পাল্লায় রাখা হতো, তাহলে মা আয়িশার পাল্লাই ভারী হতো।'[২৫]

---

[২৪] মিশকাতুল মাসাবিহ : ৬১৪৫

[২৫] قال ابن شهاب الزهري: لو جمع علم الناس كلهم وعلم أمهات المؤمنين لكانت عائشة أوسعهم علم

ইবনে হাজার (রহ.) বলেন—

> 'মা আয়িশা (রা.) এ উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে প্রাজ্ঞ নারী। তিনি ফতোয়া দিতেন, ফিকাহ শেখাতেন। নবিজির অন্য কোনো স্ত্রী সে অবস্থানে পৌঁছাতে পারেননি।'[২৬]

গ. তাঁর সমগ্র জীবদ্দশায় তিনি নবিজির মনন ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারতেন। ফিকাহের কিতাবগুলোর পবিত্রতা অধ্যায়ে অধিকাংশ সময় এ বিখ্যাত হাদিসটি বর্ণনা করা হয়—

> 'একজন আনসারি মহিলা নবিজির নিকট এলেন। তখন আয়িশা (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহিলা বেশ কয়েকটি বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলেন।
>
> প্রশ্নগুলো ছিল এমন—
>
> "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে বলুন, ঋতুর সময়ের পর কোন পদ্ধতিতে গোসল করতে হয়?"
>
> "হায়েজের পর গোসল করবে। এ সময় এক টুকরা কাপড় বা তুলা নিয়ে তাতে সুগন্ধি মাখবে, অতঃপর তা দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলবে।"
>
> "কী পরিষ্কার করব?"
>
> (নবিজি লজ্জায় মাথা নিচু করে বললেন) "সুবহানাল্লাহ! পরিষ্কার করে ফেলবে।"[২৭]
>
> এ পর্যায়ে আয়িশা (রা.) বুঝতে পারলেন, নবিজি লজ্জা পাচ্ছেন। ফলে তিনি আনসারি মহিলাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন—
>
> "সে জায়গার রক্তের চিহ্ন মুছে পরিষ্কার করে ফেলবে।"'

ঘ. আয়িশা (রা.) তাঁর কতক ছাত্রী ও আপনজনকে বললেন—'আমি ১০টি রহমতের দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত।' তাঁরা সেসব জিজ্ঞাসা করলে তিনি একে একে বললেন—

১. 'আমিই একমাত্র কুমারী নারী, যাকে নবিজি নিকাহ করেছেন।'

২. 'আমি ব্যতীত নবিজির অন্য কোনো স্ত্রী তাঁর পিতা-মাতা উভয়কে মুহাজির হিসেবে পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেনি।'

---

[২৬] ফাতহুল বারি : ৭/১০৭

[২৭] ফাতহুল বারি : ১/৪১৪

৩. 'আল্লাহ তায়ালা তাঁর পক্ষ থেকে আমার নিষ্কলুষতার ব্যাপারে আয়াত নাজিল করেছেন।'

এটা অনেক বড়ো ফজিলত যে, মা আয়িশা (রা.)-এর নিষ্কলুষতা ও মর্যাদা বর্ণনাকারী আয়াত মানুষ আজ অবধি এবং কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত করবে। কুরআনের এক সূরার প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁর শুদ্ধতা, নিষ্কলুষতা ও মর্তবা নিয়ে আলোচনা এসেছে। অন্য কোনো স্ত্রী এমনকি খাদিজা (রা.)-কে নিয়েও এমন আয়াত নাজিল হয়নি। অবশ্যই খাদিজা (রা.)-এর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যা আয়িশা (রা.)-এর মধ্যে ছিল না। আবার আয়িশা (রা.)-ও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যা খাদিজা (রা.)-এর মধ্যে ছিল না।

৪. 'নবিজি স্বপ্নে দেখতে পান, জিবরাইল (আ.) আমাকে তাঁর নিকট নিয়ে আসেন।'

৫. 'একই পাত্র থেকে আমি ও নবিজি গোসল করেছি, যে সৌভাগ্য অন্য কোনো স্ত্রীর হয়নি।' বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত, নবিজির ওফাতের পর আয়িশা (রা.)-কে বেশ কয়েকজন নারী জিজ্ঞাসা করেছিল—'আমরা কি স্বামীদের সাথে জানাবাতের গোসল করতে পারব?'

তিনি জবাব দিয়েছিলেন—

'এক পাত্রে আমি ও নবিজি গোসল করতাম।'

সহিহ ইবনে হিব্বানের বর্ণনায়—'আমি তাঁকে দেখতে পারতাম এবং তিনিও আমাকে দেখতে পারতেন।'

এক পাত্র উল্লেখ করার মানে, তাঁদের মাঝে কোনো সতর ছিল না। এ হাদিস একসঙ্গে গোসলকে বৈধতা দেওয়া ছাড়াও নবিজির মানবিকতা এবং তাঁদের মহব্বতের ইঙ্গিতও বহন করে।

৬. 'এমনও হয়েছে, তিনি আমার কামরায় নামাজ পড়তেন, আর আমি তাঁর সামনে শুয়ে থাকতাম।'

বুখারির হাদিসেও এসেছে—

> 'তাহাজ্জুদের সময় মা আয়িশা (রা.)-এর পায়ের সাথে লাগলে তিনি নড়েচড়ে ঘুমাতেন, যাতে নবিজি অনায়াসে সিজদা দিতে পারেন।'

৭. 'নবিজি যখন আমার সাথে থাকতেন, তখন ওহি নাজিল হতো। অন্য কোনো স্ত্রী এ সৌভাগ্য লাভ করেননি।'

৮. 'নবিজির ওফাত আমার ঘরে হয়। তিনি জীবনের শেষ দিকে দুর্বল হয়ে পড়লে আমার ঘরে থাকার অনুমতি চান। সুযোগপ্রাপ্ত হয়ে তিনি আমার গৃহে এক সপ্তাহ বা তার কাছাকাছি সময় অবস্থান করেন; আমার পরবর্তী পালা আসা পর্যন্ত। নবিজি যখন জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, তখন তাঁর মাথা আমার বুকে ছিল।' কারণ, মা আয়িশা (রা.) নবিজিকে কোলে নিয়েছিলেন। নবিজি ঘামছিলেন আর মা আয়িশা (রা.) তা মুছে দিচ্ছিলেন।

৯. 'আমার গৃহেই তাঁর সমাধি হয়।'[২৮] বুখারির হাদিসে বর্ণিত, আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'ইন্তেকালের মুহূর্তে আমার লালা তাঁর লালার সঙ্গে মিশেছিল।'

এখন প্রশ্ন হলো—নবিজির মুখের লালা কীভাবে আয়িশা (রা.)-এর লালার সাথে মিশেছিল? নবিজির জীবনের সর্বশেষ আমল ছিল মিসওয়াক করা। নবিজি এতটাই দুর্বল ছিলেন যে, কথা বলতে পারছিলেন না। তবে তিনি যে মিসওয়াক করতে চাচ্ছিলেন, আয়িশা (রা.) তা বুঝতে পারেন। তাই তিনি নবিজির মিসওয়াক চিবিয়ে তাঁর মাথা নরম করে দেন। আরও নরম করতে সেখানে নিজের থুতু মেশান।

আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'নবিজি মিসওয়াকখানা নিয়ে এত জোরে দাঁত মাজতে লাগলেন যে, এমনটি আমি জীবনেও দেখিনি। যেহেতু তিনি আজরাইল (আ.)-এর সাক্ষাৎ শেষে মহান প্রভুর নিকট চলে যাবেন, তাই মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তাঁর রুহানি শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।'[২৯]

আয়িশা (রা.)-এর আরেকটি বিশেষ মর্যাদা হলো, তিনি নবিজির একান্ত বন্ধুর মেয়ে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'আমি নবিজির খলিল (বন্ধু) ও খলিফার কন্যা।'

---

[২৮] আমার গৃহেই তাঁর সমাধি হয়— عن عائشة قالت: فضلت على نساء النبي صلى الله عليه و سلم بعشر قيل ما هن يا أم المؤمنين قالت لم ينكح بكرا قط غيري و لم ينكح إمرأة أبواها مهاجران غيري و انزل الله براعتي من السماء و جاءه جبريل بصورتي من السماء في حريرة و قال تزوجها فانها إمرأتك و كنت اغتسل أنا و هو من إناء واحد و لم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائه غيري و كان يصلى و انا معترضة بين يديه و لم يكن يفعل ذلك بأحد من نسائه غيري و كان ينزل عليه الوحي و هو معي و لم يكن ينزل عليه و هو مع أحد من نسائه غيري و قبض الله نفسه و هو بين سحرى و نحرى و مات في الليلة التي كان يدور على فيها و دفن في بيتي

[২৯] সিরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড-২, পৃ.-৬৫৫

নবিজির সাথে মধুর সম্পর্ক

নবিজি ও আয়িশা (রা.)-এর পারস্পরিক ভালোবাসা ছিল বেশ আলোচিত। তাঁদের ভালোবাসা এতটাই আলোচিত ছিল যে, অন্য সাহাবিরা এমনকি অন্য স্ত্রীরাও নবিজির নিকটবর্তী হওয়ার জন্য এই ভালোবাসাকে ব্যবহার করতেন।

পূর্বের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি, যখন কেউ রাসূল ﷺ-কে কিছু উপহার দিতে চাইত, তখন তাঁরা জিজ্ঞেস করত—আয়িশা (রা.)-এর দিন কবে? এর ওপর নির্ভর করেই তাঁরা পরবর্তী সময়ে রাসূল ﷺ-কে উপহার প্রদান করত। আর যুক্তিসংগতভাবেই এটা ছিল অন্য স্ত্রীদের নিকট কিছুটা বিরক্তির কারণ। এটা এমন একটি বিষয়, যা রাসূল ﷺ-এর নিয়ন্ত্রণে ছিল না।

এ ছাড়া বুখারিতে একটি বিখ্যাত হাদিস রয়েছে, যেখানে আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন—

> 'আমি আমার মাসিকের সময় একটি কাপ থেকে পানি পান করতাম।[৩০] আমি কাপটি থেকে পানি পান করার পর তা রাসূল ﷺ-কেও পান করতে দিতাম। তিনি কাপটি ঘুরিয়ে নিতেন, যাতে তাঁর ঠোঁট ঠিক সেই স্থানে স্পর্শ করে, যেখানে আমার ঠোঁট স্পর্শ করেছিল। আমি মুরগির হাড্ডি থেকে গোশত খেয়ে তা রাসূল ﷺ-কে দিতাম, তিনি সেটা ঘুরিয়ে নিতেন, যাতে তাঁর ঠোঁট ঠিক একই স্থান স্পর্শ করে, যেখানে আমার ঠোঁট স্পর্শ করেছিল।'[৩১]

---

[৩০] এখানে মাসিকের কথা উল্লেখ করার মূল কারণ হলো, একটি ফিকহি বিষয় তুলে ধরা। অর্থাৎ একজন নারীর মাসিক তাকে অপবিত্র করে না। এটাতে কোনো সমস্যা নেই।

[৩১] মুসলিম, কিতাবুল হায়েজ : ৪৮৭

এ দুটো ঘটনায় আমরা লক্ষ করলাম, প্রথমে খাওয়া শুরু করেছিলেন আয়িশা (রা.)। এর দ্বারা রাসূল ﷺ-এর অমায়িক স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েননি; বরং স্ত্রীকে প্রথমে খাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আর আমাদের কিছু সংস্কৃতি রয়েছে—(যা সঠিক বা বেঠিকের বিষয় নয়) স্ত্রীরা ততক্ষণ পর্যন্ত খায় না, যতক্ষণ না ঘরের পুরুষ খাবার গ্রহণ শেষ করে। অথচ এখানে রাসূল ﷺ-এর পরিবারে আমরা দেখি—আয়িশা (রা.) প্রথমে খাবার গ্রহণ করেছিলেন, পানাহার করেছিলেন, তারপর রাসূল ﷺ-কে দিয়েছিলেন।

আর তিনি মাসিকের কথা এ কারণেই উল্লেখ করেছিলেন যে, মদিনার প্রাক-ইসলামিক যুগের সংস্কৃতিতে ইহুদিদের আইনানুসারে বলা হতো—মাসিকের সময় নারীরা অপবিত্র হয়ে যায়। এর কিছু প্রভাব আজও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। মাসিকের সময়ে নারীরা অপবিত্র হয়ে যায়—এই চিন্তার দ্বারা বিষয়টি এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, সে যদি কিছু স্পর্শ করে, তাহলে তা থেকে কেউ খেতে বা পান করতে পারবে না। একই টেবিলে বসতে পারবে না, একই থালায় খাবার খেতে পারবে না। পুরো সপ্তাহের জন্য তাকে অন্য কোথাও বসতে হবে, পৃথক অবস্থায় খাবার খেতে হবে এবং পৃথক হয়ে ঘুমাতে হবে। পুরো সপ্তাহজুড়ে তাঁর একটি আলাদা বিছানা থাকবে অথবা স্বামী-স্ত্রীর আলাদা বিছানা থাকবে।

আর এই বিষয়টি আনসাররা ইহুদিদের থেকে গ্রহণ করেছিল। এ কারণে আয়িশা (রা.) বলেছিলেন—'মাসিকের সময়ে আমি তাঁর চুল আঁচড়ে দিতাম।' আয়িশা (রা.)-এর মাসিকের কথা উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো—শরিয়াহর বিষয়টি তুলে ধরা। অর্থাৎ একজন নারী তাঁর মাসিকের সময়ে স্বামীর সেবা করতে পারবে, রান্না করতে পারবে, স্বামীর সাথে খেতে পারবে, পানাহার করতে পারবে, স্বামীর সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমাতে পারবে। তবে নিষিদ্ধ হলো শারীরিক সম্পর্ক। এই একটি বিষয় ছাড়া খাওয়া, পানাহার করা, চুল আঁচড়ানো ইত্যাদি সবকিছুই হালাল।

আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'আমার মাসিকের সময় রাসূল ﷺ-এর চুল আঁচড়ে দিতাম; তখন তিনি আমার কোলে শুয়ে থাকতেন।'[৩২]

---

[৩২] বুখারি : ২৯৭

এমনকি রাসূল ﷺ-এর চুল কিংবা মাথার নিকটবর্তিতাও কোনো সমস্যা তৈরি করত না। কেননা, আয়িশা (রা.) তখন অপবিত্র ছিলেন না। তখন ছিল না কেবল একটি কর্মের অনুমতি। এ ছাড়া বাকি সবকিছুরই অনুমতি ছিল।

আয়িশা (রা.) নিজে বলেছেন—

> 'একদিন রাসূল ﷺ খুব ভালো মেজাজে ছিলেন। তাই আমি রাসূল ﷺ-কে বললাম—"হে রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য একটু দুআ করুন।" রাসূল ﷺ বললেন—"হে আল্লাহ! তুমি আয়িশাকে মাফ করে দাও। তাঁর সকল গুনাহ, যেগুলো সে করেছে এবং করছে, সব মাফ করে দাও। আর মাফ করে দাও সে সকল গুনাহ, যেগুলো সে গোপন রেখেছে এবং যেগুলো সে প্রকাশ্যে করেছে।"'

এতে আয়িশা (রা.) খুব খুশি হলেন এবং জোরে হাসতে লাগলেন। আর হাসতে হাসতে তিনি বিছানায় বসে পড়লেন। তাঁর হাসি খুব দৃশ্যমান ছিল বিধায় রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন—

'আমার এই দুআ কি তোমাকে এতই খুশি করেছে?'

তিনি বললেন—'হ্যাঁ।'

রাসূল ﷺ বললেন—'আমার প্রত্যেক নামাজের পর আমি এ দুআটি পুরো উম্মতের জন্য করে থাকি।'

তবে এখানে দুআটি একটি বিশেষায়িত দুআ। কারণ, এখানে আয়িশা (রা.)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মূল দুআটি হলো—

> 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে মাফ করে দাও এবং তাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দাও। তাদের অতীত, বর্তমান, প্রকাশ্য, গোপনীয় সকল গুনাহকে তুমি ক্ষমা করে দাও।'

তিনি বলেন—'আমি নিয়মিত আমার উম্মতের জন্য এই দুআ করি।'[৩৩]

কিন্তু তিনি এখানে আয়িশা (রা.)-কে বিশেষায়িত করেছেন। অবশ্যই এটি অনেক বড়ো একটি ব্যাপার। কেননা, রাসূল (সা.) একদিকে পুরো উম্মতের কথা বলেছেন, অন্যদিকে কেবল আয়িশা (রা.)-কে উল্লেখ করেছেন।

---

[৩৩] ইবনে হিব্বান : ৭১১১

এভাবেই আয়িশা (রা.) রাসূল ﷺ-এর দুআর একটি বড়ো অংশ হতেন। এজন্য আয়িশা (রা.)-এর প্রতি রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসা খুবই আলোচিত ছিল। তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করতেন, যাতে আল্লাহ তাঁকে মাফ করে দেন। সেগুলোও মাফ করে দেন, যেগুলো তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না।

বুখারি শরিফে বর্ণিত হয়েছে—

> 'রাসূল ﷺ তাঁর সকল স্ত্রীর সাথে সময়ের ব্যাপারে কিংবা টাকা-পয়সার ব্যাপারে ওয়াদা করতেন। তারপর তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করতেন—
>
> "হে আল্লাহ! এটা হলো আমার স্ত্রীদের সাথে আমার সততা ও সুবিচার। আমি যেন এটা বাস্তবায়ন করতে পারি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও, যেটা আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না (অর্থাৎ আয়িশা রা.-এর প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা)। আমি এই ভালোবাসাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, তাই আপনি এর জন্য আমাকে মাফ করে দিন।"'[৩৪]

আরেকটি বিখ্যাত হাদিস রয়েছে। আমি পুরো হাদিস তুলে ধরছি না। কারণ, অধিকাংশরই এই হাদিসটি জানা। হাদিসটি হলো, আয়িশা (রা.) এবং রাসূল ﷺ-এর মাঝে দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটা তাঁদের ভালোবাসার একটি অন্যতম আমোদপূর্ণ নিদর্শন। যেমনটা আমরা জানি, রাসূল ﷺ তাঁর জীবনকালে দুবার (এরচেয়ে বেশিও হতে পারে) আয়িশা (রা.)-এর সাথে মরুভূমির মাঝে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন। এখন আপনি একটু চিন্তা করুন এবং অবশ্যই এগুলো একদম স্পষ্ট, এটা আমাদের অন্তরকে খুলে দিতে পারে। যখন আমরা কারও সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করি, তখন শুরুতে একটি লাইন দিতে হয়, আবার শেষ প্রান্তে একটি সীমারেখা দিতে হয়। দৌড় শুরু করার জন্য আপনাকে অবশ্যই এতটুকু করতে হবে। এগুলো সারা পৃথিবীতে প্রচলিত। আর আয়িশা (রা.) এবং রাসূল ﷺও সেই দৌড় প্রতিযোগিতা করলেন। আপনারা হাদিস সূত্রে জানেন, প্রথমবারে যখন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, তখন আয়িশা (রা.) ছোটো ছিলেন। আয়িশা (রা.) বলেন—

---

[৩৪] জাদুল মাআদ : ১/১৫১

> 'আমি বয়সে তখনও ছোটো ছিলাম। তবুও রাসূল ﷺ-কে পরাজিত করেছিলাম। আমি এটা নিয়ে মজা করতাম। আর বলতাম—"আমি আপনাকে হারিয়ে দিয়েছি!" পরেরবার যখন দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম, তখন রাসূল ﷺ হয়তো প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। আর আমার ওজনও একটু বেড়ে গিয়েছিল। তাই এবার রাসূল ﷺ বিজয়ী হলেন। ফলে এটা পূর্বের ব্যাপারটাকে মিটমাট করে দিলো।'[৩৫]

দেখুন, তাঁদের আনন্দটা এখানেই। এটা রাসূল ﷺ ও আয়িশা (রা.)-এর জীবনের অন্যতম ঘটনা। যেমনটা আমরা আগেও বলেছি, এই বর্ণনাগুলোর বেশিরভাগ গোপন থাকা উচিত; আর অনেকটা গোপন আছেও। কিন্তু হাদিসের মাধ্যমে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, তা পুরো চিত্রটাকে অনুধাবন করার জন্য যথেষ্ট।

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে—

> 'রাসূল ﷺ-এর একজন প্রতিবেশী ছিল—যার আদি নিবাস ছিল পারস্যে। তিনি ছিলেন রান্নার জন্য খুব প্রসিদ্ধ। একদিন তিনি রাসূল ﷺ-কে দাওয়াত দেওয়া জন্য একজন বার্তাবাহককে পাঠান। রাসূল ﷺ তখন আয়িশা (রা.)-এর ঘরে। আর রাসূল ﷺ জানতেন, আয়িশা (রা.) কোন খাবারটা পছন্দ করেন। তাই তিনি বার্তাবাহককে জিজ্ঞেস করলেন—দাওয়াত কি কেবল তাঁর জন্য, নাকি উভয়ের জন্য? সম্ভবত বার্তাবাহক জানতেন না কিংবা তার সেই অধিকার ছিল না যে, এর যথাযথ উত্তর দেবে। তাই সে বলল—
>
> "এ দাওয়াত কেবল আপনার জন্য।"
>
> এরপর রাসূল ﷺ ভদ্রভাবে তার দাওয়াত ফিরিয়ে দিলেন। তখন বার্তাবাহক বলল—"না না, আপনারা উভয়েই আসবেন।"
>
> অতঃপর রাসূল ﷺ আয়িশা (রা.)-কে সাথে নিয়ে সেখানে গেলেন এবং খাওয়ায় অংশগ্রহণ করলেন।'[৩৬]

এই ঘটনা আমাদের সামনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপমা হাজির করে।

---

[৩৫] মুসনাদে আহমাদ : ৬/৩৯; আবু দাউদ : ২৫৭৮

[৩৬] মুসলিম : ২০৩৭

এখান থেকে আমরা নবিজির একটি সুন্নাহ শিখলাম। আর সেটা হলো, বিদেশি রান্নার প্রতি ভালোবাসা। কেননা, এটা ছিল পার্সিয়ান খাবার; কোনো সাধারণ খাবার না। সেই খাবারটি রাসূল ﷺ ও আয়িশা (রা.) পছন্দ করতেন। ভিন্ন খাবারের অভিজ্ঞতা কে না পছন্দ করে! তাই রাসূল ﷺ এই দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এখানে আমাদের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। যখন কোনো দাওয়াত আসবে, তখন দাওয়াতদাতার অনুমতি ব্যতীত সেটাকে বর্ধিত করা যাবে না। যদি তিনি এমন কেউ হন, যে তাঁর পরিবারের সদস্য বা পছন্দের মানুষ; এমনকি স্ত্রী হলেও তাকে বিনা অনুমতিতে সাথে নেওয়া যাবে না। তাই রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করেছিলেন—'দাওয়াত কি কেবল আমার জন্য, নাকি আমাদের উভয়ের জন্য?'

তখনকার প্রচলিত প্রথা অনুসারে, সম্ভবত সেই বার্তাবাহক দাসের দাওয়াত বর্ধিত করার অধিকার ছিল না। সে চিন্তিত ছিল, এতে তার মালিক কিছু বলে বসে কি না। তাই সে প্রথমে বাধা দিয়েছিল; যদিও এটা ভাবা যায় না যে দাওয়াতদাতা এখানে নারাজ হবে। এজন্য সম্ভবত যোগাযোগের একটি ব্যাঘাত ঘটে। ফলে দাসটি বলেছিল—'দাওয়াত কেবল আপনার জন্য।' আবার রাসূল ﷺ সবিনয়ে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এটা আমাদের দেখায়, দাওয়াত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এটা ওয়াজিব না। আপনি যেকোনো যুক্তিসংগত কারণে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। তবে কিছু মানুষ রয়েছে—যারা এই ব্যাপারে খুব চরম পর্যায়ে চলে যায়। তাঁরা বলে—আপনাকে অবশ্যই দাওয়াতে সাড়া দিতে হবে।

এখানে দেখতে পাচ্ছি, রাসূল ﷺ দাওয়াতে সাড়া দিয়েছেন। কেননা, একটি হাদিসে বলা হয়েছে—

> 'যখন কোনো মুসলমান ভাই আপনাকে দাওয়াত দেবে, তখন তা গ্রহণ করবেন।'[৩৭]

কারণ, এটা আপনার ভাইয়ের অধিকার। আবার দাওয়াত কবুল করলে তা পালন করা আপনার কর্তব্য। এ ছাড়া হাদিসটি আমাদের আরও শেখাচ্ছে—যদি আপনি সক্ষম হন, তাহলে দাওয়াত গ্রহণ করুন। এটা গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়। তবে এ হাদিসে রাসূল ﷺ-এর কী ওজর ছিল—তাও বিবেচনায় রাখতে হবে। এখানে রাসূল ﷺ আয়িশা (রা.)-কে রেখে একা যেতে চাচ্ছিলেন না। অর্থাৎ তিনি ছিলেন আয়িশা (রা.)-এর অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

---

[৩৭] বুখারি : ১২৪০; মুসলিম : ২১৬২

নবিজি এক দাওয়াত খেতে গেলে আয়িশা (রা.) একাকিত্ব বোধ করতেন। কারণ, সেদিন তাঁর ভাগের রাত ছিল। তিনি সপ্তাহে কেবল একদিনই রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হতে পারতেন। আর সেই রাতে কেউ একজন রাসূল ﷺ-কে দাওয়াত দিলো (রাসূল সেখানে গেলে তিনি আবার এক সপ্তাহের জন্য রাসূলকে পেতেন না)। ফলে সেখানে রাসূল ﷺ-একা যেতে চাচ্ছিলেন না। অর্থাৎ এখানে দুটি কারণ থাকতে পারে—

প্রথমত, রাসূল ﷺ জানতেন, আয়িশা (রা.) এই খাবারটি খুব পছন্দ করেন।

দ্বিতীয়ত, রাসূল ﷺ সেদিন সন্ধ্যায় আয়িশা (রা.)-কে একা রেখে যেতে চাচ্ছিলেন না। কারণ, পুরো এক সপ্তাহ পর তিনি তাঁর সাথে ছিলেন এবং সপ্তাহের মধ্যে কেবল একটি রাতই আয়িশা (রা.) পেতেন। তাই তিনি তাঁর সঙ্গে সময় ব্যয় করতে চেয়েছিলেন। আর যখন দাওয়াতবাহক বলল—আপনারা উভয়েই আসতে পারবেন, কেবল তখনই রাসূল ﷺ দাওয়াতে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

আর এই ঘটনা আমাদের এটাও শেখায় যে, দাওয়াতদাতাকে মানিয়ে নিয়ে দাওয়াত বর্ধন করা যেতে পারে। এটাতে কোনো সমস্যা নেই। যখন আপনি কোনো দাওয়াত পাবেন, তখন বলতে পারেন—আমার সাথে একজন বন্ধু আছে। আমি কি তাকে সাথে নিয়ে আসতে পারব? এটা পরিবারের সদস্যদের জন্যও হতে পারে। আর দাওয়াতদাতা এ ব্যাপারে হ্যাঁ বা না উভয়টাই বলার অধিকার রাখে; যেমনটা অত্র হাদিসে দেখা যায়।

এ ছাড়া আয়িশা (রা.)-এর আরও একটি হাদিস রয়েছে—যা আরবদের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধ, কিন্তু অনারবদের মাঝে তেমন প্রসিদ্ধ নয়। কেননা, হাদিসটি খুবই জটিল। যদিও এটি বুখারি ও মুসলিম শরিফে স্থান পেয়েছে। অন্য ভাষাভাষীদের কাছে এটি পরিচিত না হওয়ার কারণ হলো—এ হাদিসের ওপর কোনো লেকচার দিতে হলে আরবিতে খুবই দক্ষ হতে হবে। এটি একটি কাব্যালংকৃত হাদিস। এটির সারমর্ম অনেকটা এমন—

নারীদের একটি দল আয়িশা (রা.)-এর সাথে দেখা করতে এলো। তারপর পারস্পরিক কথা বলতে শুরু করল। তাঁরা তাঁদের স্বামী-স্ত্রীদের গল্প নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। এরপর পৌরাণিক কাহিনিগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। এখানে মূলত পৌরাণিক কাহিনি অথবা প্রাক-ইসলামিক যুগের ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো সংখ্যায় ছিল **১১টি**। আর এ হাদিসটি

অনুচ্ছেদ বা লাইনের আকার ১১টি ঘটনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। বিষয়টি হচ্ছে, প্রত্যেকটি ঘটনাই কোনো না কোনো উপকারিতা বা শিক্ষা নিষ্পন্ন করেছে। কিন্তু এই এক লাইনের ঘটনাগুলো আমাদের ভাষায় বোধগম্য হওয়া কঠিন। আরবি ভাষায় বর্ণিত এগুলো কাব্যালংকৃত বাক্য। আরবিতে কথাগুলো অনেক পরিণত। এ কারণে একটি হাদিসের জন্য পাঁচ পৃষ্ঠার ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে। কারণ, আরবি ভাষা অনেক গভীর ও অগ্রবর্তী।

খেয়াল করে দেখবেন, যে বইয়ে এই হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে, সেখানে লম্বা করে পাদটীকাসহ প্রত্যেক শব্দের অর্থ রয়েছে। এটা হলো গল্পের আকারে একটা শিক্ষামূলক কবিতার মতো। এটা নিখাদ কবিতা নয়, কিন্তু কবিতাসুলভ। এখানে ১১টি ঘটনার মধ্যে কেবল আমাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ১১তম ঘটনাটির সারমর্ম উল্লেখ করব।

১১ নম্বর ঘটনায় দুটি চরিত্র—আবু জারা ও উম্মে জারা। এটা এমন একটি ঘটনা, যেখানে উম্মে জারা ও আবু জারা পরস্পরকে খুব ভালোবাসতেন। বিশেষ করে উম্মে জারা বেশি ভালোবাসতেন আবু জারাকে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটে যায় এবং বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। পরবর্তী সময়ে উম্মে জারা একজন সম্পদশালী ও উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। কিন্তু তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্বামীকে বলেছিলেন—'যদি আপনি এই পৃথিবীর সবকিছুও আমাকে দিয়ে দেন, তবুও আবু জারা আমাকে ভালোবাসার মাধ্যমে যা দিয়েছেন, তার এক ভাগও হবে না।' এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে, এটি একটি খুবই শক্তিশালী ভালোবাসার কাহিনি ছিল।

তাই রাসূল ﷺ আয়িশা (রা.)-কে বলেছিলেন—

> 'তোমার জন্য আমার ভালোবাসা উম্মে জারার প্রতি আবু জারার ভালোবাসার ন্যায়। কেবল এটাই ভিন্ন যে, আমি তোমাকে কখনো তালাক দেবো না।'[৩৮]

অর্থাৎ আয়িশা (রা.)-এর জন্য এটা ছিল একটি আশ্বাস। বিষয়টি এমন না যে, তাঁর এই আশ্বাসের খুব প্রয়োজন ছিল। আরবরা এই ভালোবাসা সম্বন্ধে জানে। ১১টি ঘটনার মধ্যে ১১তম ভালোবাসার ঘটনাটিই সবচেয়ে শক্তিশালী বর্ণনা। তাই রাসূল ﷺ মন্তব্য করেছিলেন, তোমার জন্য আমার

[৩৮] শামায়েলে তিরমিজি, অধ্যায় ما جاء في كلام رسول الله ﷺ في السمر হাদিস : ১৮৮

ভালোবাসা উম্মে জারার প্রতি আবু জারার ভালোবাসার ন্যায়। কিন্তু আমি তোমাকে তালাক দিচ্ছি না। কেননা, ওই ঘটনায় বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো—আমরা এখানে রাসূল ﷺ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ খোশগল্প পেলাম।

রাসূল ﷺ যে সপ্তাহে ইন্তেকাল করেছিলেন, তার দুই সপ্তাহ পূর্ব থেকে তিনি দুর্বল হতে থাকলেন। শেষ সপ্তাহে একদম দাঁড়াতেই পারছিলেন না। তাই তিনি সকল স্ত্রীকে ডাকলেন। অতঃপর তাঁদের থেকে এই বলে অনুমতি প্রার্থনা করলেন—

> 'তোমরা তো দেখছ, আমি কী অবস্থায় আছি। যদি তোমরা গ্রহণযোগ্য মনে করো, তবে আমি কিছুদিন আয়িশার ঘরে থাকতে চাই।'[৩৯]

অর্থাৎ যেহেতু আমি এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে পারছি না, তাই আমাকে একটি ঘর বাছাই করতে হবে। এখন আমি শারীরিকভাবে দাঁড়াতে সক্ষম নই। যদি তোমরা ঠিক মনে করো, তবে আমি কি আয়িশার ঘরে কিছুদিন থাকতে পারি? তাঁরা সকলেই রাসূল ﷺ-কে অনুমতি দিয়েছিলেন। ফলে তিনি জীবনের শেষ সপ্তাহে আয়িশা (রা.)-এর ঘরে ছিলেন।

আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'আমি পরবর্তী সময়ে সর্বদা এটা নিয়ে গর্ব করতাম। যেদিন তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন, সেটাও কোনো না কোনোভাবে আমার দিন ছিল।'[৪০]

অর্থাৎ এই পুরো আবর্তনে এটা কোনো না কোনোভাবে আমার দিনে হওয়ার কথা ছিল। তাই এটা সৌভাগ্যের বিষয়।

এ ছাড়াও আমাদের কাছে একটি প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে—শেষ সপ্তাহে যখন রাসূল ﷺ ইন্তেকালের সন্নিকটে, তখনও আয়িশা (রা.) এ বিষয়ে জানতেন না। অর্থাৎ প্রথম দিকে তাঁর কাছে এমন মনে হয়নি রাসূল ﷺ ইন্তেকাল

---

[৩৯] لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتدَّ وجعُه؛ استأذن أزواجَه أن يُمرَّض في بيتي، فأذِنَّ له؛ فخرج بين رجلين تخطُّ رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر
বুখারি : ৬৬৫; মুসলিম : ৪১৮

[৪০] বুখারি : ৪০৮৪; মুসলিম : ৪৪৭৩

করতে যাচ্ছেন। এজন্য শুরুর দিনগুলোতে রাসূল ﷺ নিজের মৃত্যুর জন্য আয়িশা (রা.)-কে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন।

একটি প্রসিদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

> 'রাসূল ﷺ যখন প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলেন, তখন আয়িশা (রা.)-এরও হালকা মাথাব্যথা ছিল। এজন্য তিনি মাথায় হাত রেখে ঘরের ভেতরে হাঁটাহাঁটি করছিলেন আর বলেছিলেন—"ও আমার মাথা! ও আমার মাথা!"'[৪১]

আমাদের ব্যথা হলে যেমনটা করে থাকি আরকি। আরবি যেহেতু খুব সুন্দর একটি ভাষা, তাই এখানে ব্যথা বোঝানোর জন্য ভিন্ন শব্দ রয়েছে। এটা ওয়াও ও আলিফ একসঙ্গে মিলিয়ে পড়ে বোঝানো হয়।

আয়িশা (রা.) বলছিলেন—'ও আমার মাথা! ও আমার মাথা!' এই বলে মাথা নাড়াচ্ছিলেন, আর রাসূল ﷺ চেয়ে চেয়ে তাঁর অবস্থা দেখছিলেন। নবিজি যেহেতু নিজের মৃত্যুর দিকে ধাবিত হওয়ার অবস্থাটা বুঝতে পারছিলেন, তাই আগত পরিস্থিতির জন্য আয়িশা (রা.)-কে প্রস্তুত করতে চাইছিলেন এবং বোঝাতে চাইছিলেন, আমার মৃত্যু সংবাদের জন্য প্রস্তুত হও। তাই মৃত্যুর প্রসঙ্গ আনার জন্য তিনি একটা কৌশল অবলম্বন করলেন। আয়িশা (রা.)-কে বললেন—'ও আমার মাথা' বলার পরিবর্তে 'আমার মাথা' বলা উচিত। তারপর বললেন—

> 'এখন যদি তুমি এই ব্যথার কারণে ইন্তেকাল করো, তখন কী হবে? এমনটা হলে তোমার জানাজা, গোসল, দুআ ও দাফনের কাজ আমি পরিচালনা করব। তোমার প্রতি আমার দুআর চেয়ে আর বেশি কী চাইতে পারো?'

এভাবেই তিনি জানাজা ও মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে আনলেন। তারপর বললেন—

> 'তুমি কেন চিন্তিত—যেখানে আমি ইন্তেকাল করতে যাচ্ছি।'

এবার তিনি মৃত্যুর বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। আয়িশা (রা.) তখনও অল্পবয়সি ছিলেন, তাই তাঁর চিন্তা সেদিকে গেল না; বরং তাঁর মাথায় অন্য চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন—আমি যদি এখানে না থাকি (অর্থাৎ মরে যাই), তাহলে রাসূল ﷺ কী করবেন? এই ভেবে তিনি তৎক্ষণাৎ নবিজিকে বললেন—

---

[৪১] বুখারি

> 'আমি নিশ্চিত, আমি মরে গেলে ওই সন্ধ্যাতেই আপনাকে অন্য স্ত্রীর ঘরে পাওয়া যাবে?'[৪২]

অর্থাৎ তিনি রাসূলের মন্তব্যকে ভুল বুঝে ভাবলেন—ওহ! আপনি আমাকে ইঙ্গিতে বোঝাতে চাচ্ছেন যে, আমার এই পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকা উচিত—যাতে আপনি অন্য স্ত্রীর কাছে যেতে পারেন। সেখানে শান্তি পেতে পারেন। বুঝি না? বুঝি তো!

এমন ঈর্ষার নজির আরও দেখা যায়। এমন ঈর্ষানুভূতির ভূরিভূরি উদাহরণ রয়েছে। এটা উল্লেখ করতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, তিনি একটি নির্দিষ্ট ঘটনার ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন।

মানবীয় ঈর্ষা এবং আমাদের শিক্ষা

ঈর্ষা হলো ভালোবাসার নিদর্শন। ঈর্ষা কীসের থেকে আসে? কেন আয়িশা (রা.) এমনটা অনুভব করেছিলেন? কারণ, তিনি রাসূল ﷺ-এর মনোযোগের সিংহভাগটা পেতে চাইতেন। আর তিনি পর্যাপ্ত পেতেনও, তারপরও আরও বেশি চাইতেন। এই চাওয়াটা তাঁর জন্য হালাল। এই চাওয়াটা তাঁর ভালোবাসার নিদর্শন। অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসা ও মনোযোগ চাওয়াটা তাঁর জন্য দোষের কিছু নয়। এগুলো নিয়ে অনেক আনন্দঘন ঘটনা রয়েছে। কিছু আছে বেশ রসাত্মক। বিশেষ করে আয়িশা (রা.)-এর ঈর্ষার ঘটনাগুলো।

রাসূল ﷺ বলেন—

> 'সতিনদের মধ্যে এই ঈর্ষানুভূতি মূলত প্রকৃতিগত। আল্লাহ্ তায়ালা এর জন্য কোনো শাস্তি দেবেন না; যতক্ষণ এটি একটি স্বাভাবিক পর্যায়ে থাকবে।'

আয়িশা (রা.) জানতেন—তিনি আল্লাহর রাসূলের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী, তারপরও তাঁর মনে ঈর্ষা জাগ্রত হতো। প্রথমত, এটা তাঁর সরলতা ও অল্পবয়সি স্বভাবের পরিচায়ক। কেননা, স্ত্রীদের মাঝে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে কম বয়সি। দ্বিতীয়ত, এটা ভালোবাসার নিদর্শন। রাসূল ﷺ-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা অনেক বেশি ছিল। তিনি রাসূল ﷺ-এর সিংহভাগ জুড়ে থাকতে চাইতেন। এজন্য তিনি যেকোনো ধরনের প্রতিযোগিতা করতে রাজি ছিলেন। এটা তাঁকে অনুপ্রাণিত করত। তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন—'রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীগণ ছিলেন দুভাগে বিভক্ত।' এক ভাগের নেতৃত্বে ছিলেন

আয়িশা (রা.)। সেখানে অন্যদের মধ্যে ছিলেন হাফসা (রা.), সাফিয়া (রা.) ও সাওদা (রা.)। অন্য দলে ছিলেন উম্মে সালামা (রা.) ও জয়নব (রা.)। বিশেষ করে জয়নব (রা.) ছিলেন এ দলের সরব ব্যক্তি। এ দল দুটি ছিল মূলত ভালোবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা জয়নব (রা.)-এর আলোচনা সামনে আনব।

আয়িশা (রা.) বুঝতেন, ভালোবাসার দিক থেকে তাঁর সাথে কেবল একজন স্ত্রীর-ই প্রতিযোগিতা সম্ভব। আর তিনি হলেন জয়নব (রা.)। যদিও আয়িশা (রা.) ভালোবাসাপ্রাপ্তির দিক থেকে ছিলেন এক নম্বরে, কিন্তু তিনি জানতেন, জয়নব (রা.)-এর জন্য রাসূল ﷺ-এর অনুভূতি কাজ করে। তাই তাঁদের মধ্যে একটা ঠান্ডা লড়াই চলত। কখনো কখনো নিজ দলের মধ্যেও প্রতিযোগিতা চলত। এ ব্যাপারে খুবই প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা উল্লেখ করছি—যা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন।

বুখারি শরিফে এসেছে, আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেছেন—

> 'যখন রাসূল ﷺ কোনো ভ্রমণে যেতেন, তখন স্ত্রীদের অনুভূতি লক্ষ করতেন।'[৪৩]

বাস্তবতা হলো, কোনো ভ্রমণের বেলায় একদম ন্যায্য হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, আপনি হয়তো বিশেষ প্রয়োজনে কোনো জায়গায় ভ্রমণ করতে যান। সে সময় সকল স্ত্রীকে সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। যে যেতে চায়, তাকে নেওয়া ঠিক হবে কি না আপনি কেবল এটা যাচাই করে দেখতে পারেন।

আর এখানে রাসূল ﷺ 'অনুভূতি লক্ষ করতেন' এ কথা বলতে কী বোঝায়, আশা করি তা বুঝতে পেরেছেন। অর্থাৎ সকলের মাঝে চিহ্নিত করার মতো বিশেষ কিছু জিনিস থাকে। যেগুলো বিবেচনা করে একজনকে বাছাই করা হয়, আর বাকিদের না করে দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি কিছু জিনিস একটি ব্যাগে নিলেন, তারপর ব্যাগটা ওঠালেন, তার থেকে একজন বের হলো, আর যে বের হলো সেই বাছাইকৃত (অনেকটা লটারি বা দৈবচয়নের মতো)। আর যদি আপনি সকলকে নিয়ে যেতে পারেন, তাহলে আরও ভালো। আর সেটা সম্ভব না হলে আপনার পক্ষে একদম ন্যায্য হওয়া সম্ভব হবে না।

---

৪৩ বুখারি : ২৫৯৩; মুসলিম : ২৭৭০

উল্লেখ্য, রাসূল ﷺ বেশিরভাগ ভ্রমণে কোনো স্ত্রীকেই নিয়ে যাননি। কিছু ভ্রমণে তিনি একজন স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর অল্প কিছু ভ্রমণে দুই বা এর বেশিসংখ্যক স্ত্রীদের সাথে নিয়েছিলেন। কিন্তু হজের সময়ে তিনি সকলকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এক সফরে আয়িশা (রা.) ও হাফসা (রা.) নির্বাচিত হয়েছিলেন; যদিও হাফসা (রা.) তাঁর দলেরই ছিল। যখন তাঁরা ভ্রমণের জন্য প্রস্তুতি হিসেবে সবকিছু গোছগাছ করছিলেন, তখন হাফসা (রা.) আয়িশা (রা.)-এর কাছে গেলেন। হাফসা (রা.) বয়সে বড়ো ছিলেন। আর এগুলো এমন জিনিস, যেগুলো সতিনদের মধ্যে উপেক্ষা করা হয় বা ক্ষমার চোখে দেখা হয়। পরবর্তী সময়ে হাফসা (রা.) কিছু একটা করলেন এবং বললেন—

> 'চলো, আমরা এবার রোমাঞ্চকর কিছু করি। কাউকে না বলেই আমাদের কাফেলা বদলাবদলি করি। তুমি আমার উটে চড়ো, আর আমি তোমার উটে চড়ি। তারপর দেখব কী হয়।'

আয়িশা (রা.) রাজি হলেন। রোমাঞ্চকর বা ভিন্ন কিছু করার ইচ্ছা তাঁকেও পেয়ে বসল। পরিকল্পনা অনুযায়ী আয়িশা (রা.) হাফসা (রা.)-এর উটে আর হাফসা (রা.) আয়িশা (রা.)-এর উটে চড়ে বসলেন।

দীর্ঘ ভ্রমণের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর অভ্যাস ছিল, রাতে নিজের উট আয়িশা (রা.)-এর উটের কাছে রাখতেন এবং রাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। সেই অনুযায়ী সেদিনও রাসূল ﷺ নিজের উট আয়িশা (রা.)-এর উটের কাছে রাখলেন এবং কথা বলা শুরু করলেন। কিন্তু আয়িশা (রা.) তো ছিলেন আরেক উটে। কিছুক্ষণ পর রাসূল ﷺ বুঝতে পারলেন, হাফসা (রা.) কী করেছে। ফলে ক্যাম্পের সময়কালে তিনি হাফসা (রা.)-এর সাথে ছিলেন এবং আয়িশা (রা.) ছিলেন একা। আর এটা ওই অবস্থায় চলনসই ছিল। কারণ, এটা নির্ধারিত ছিল না।

আয়িশা (রা.) যখন এ ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন তাঁর বয়স ৫০ বা ৬০ বছর হবে। তিনি বলেন—

> 'ওই রাতে আমি এমন অনুভব করছিলাম, যেন জঙ্গলের কাঁটাগুলোর মাঝে নিজের পা ঢুকিয়ে দিই। নিজের বিরুদ্ধে দুআ করি—"হে আল্লাহ! একটি বিচ্ছু অথবা সাপ প্রেরণ করুন, যেন সে আমাকে দংশন করে।"'

তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন—

> 'আমি হাফসাকে কিছু বলতে পারছিলাম না। কারণ, আমি স্বেচ্ছায় তাঁর সাথে উট বদলাবদলি করেছিলাম।'[৪৪]

আপনারা জানেন, মানুষের যখন রাগ হয়, তখন তাঁরা অনেক কিছুই করে। ইনশাআল্লাহ, এ ব্যাপারে আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করে দেবেন। এগুলো এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না, যেগুলো নিয়ে আমাদের পড়াশোনা করা উচিত। এ ছাড়া তখন তিনি ছিলেন অল্পবয়সি। আর এগুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক সত্য, যেগুলো সবার জীবনেই হয়ে থাকে।

এ রকম ঈর্ষার আরও একটি উদাহরণ আছে—যা প্রমাণ করে, রাসূল ﷺ সর্বদা নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা কম ছিল, তখন আল্লাহ তায়ালা উম্মুল মুমিনিনদের দুটি পথ দিয়েছিলেন—হয় তোমরা অনেক টাকা নাও, নাহয় রাসূল ﷺ-এর সাথে থাকো। আমরা সূরা আহজাবে উল্লিখিত এ ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। একদিন তাঁরা রাসূল ﷺ-এর কাছে খোরপোশ নিয়ে অভিযোগ করছিলেন এবং বিলাসী জীবন কামনা করছিলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা নাজিল করেন—

> يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا - وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا-
>
> 'যদি তোমরা অর্থ চাও, তাহলে আসো—আমি তোমাদের তা দেবো। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে থাকতে চাও, তাহলে তোমাদের সাদামাটা জীবন গ্রহণ করতে হবে।'[৪৫]

আমরা জানি, এ আয়াতটি এমন সময় নাজিল হয়েছিল, যখন রাসূল ﷺ ২৯ দিন ধরে মসজিদে অবস্থান করছিলেন। তখন একটা কঠিন সময় চলছিল। এক মাস যাবৎ রাসূল ﷺ কোনো স্ত্রীর কাছে যাননি। এই দীর্ঘ সময়টা তিনি মসজিদেই ঘুমাচ্ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নাজিল করলেন—

---

[৪৪] ফাতহুল বারি, খণ্ড-৯, পৃ.-২২১, হাদিস নং : ৪৯১৩

[৪৫] সূরা আহজাব : ২৮-২৯

> 'দেখো, তোমাদের জন্য এ দুটি পথ আছে। যদি তোমরা অর্থ চাও, তাহলে অর্থ পাবে। সেক্ষেত্রে তোমরা যার যার পথে চলে যাবে এবং তালাক হয়ে যাবে। অথবা তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে থাকবে এবং একটি সাদামাটা জীবন কাটাবে।'

হাদিসে আছে—এ আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ প্রথম যে স্ত্রীর নিকট গিয়েছিলেন, তিনি হলেন আয়িশা (রা.)। কারণ, রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন যে, হয়তো আয়িশা (রা.) সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে একটু অপরিপক্ব হতে পারেন। তাই তিনি এই বলে কথা শুরু করলেন—

> 'হে আয়িশা! আল্লাহ তায়ালা কিছু আয়াত নাজিল করেছেন। সেখান থেকে তোমাকে যেকোনো একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তুমি দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ো না। তোমার মা-বাবার সঙ্গে আলোচনা করার পর সিদ্ধান্ত নিয়ো। এজন্য কিছু সময় নাও।'[৪৬]

অর্থাৎ রাসূল ﷺ চাননি যে আয়িশা (রা.) যুবতি বয়সের প্রভাবে আবেগি ও দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত নিক এবং এজন্য পরবর্তী জীবনে আফসোস করুক। রাসূল ﷺ বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি অবশ্যই চাচ্ছিলেন, আয়িশা (রা.) তাঁর সাথে থাকুক। নবিজির কথা শুনে আয়িশা (রা.) বললেন—'পথ দুটো কী কী?'

রাসূল ﷺ উক্ত আয়াত পাঠ করলেন। উত্তরে আয়িশা (রা.) বললেন—

> 'এটা এমন কী ব্যাপার, যা নিয়ে বাবা-মায়ের সাথে আলোচনা করতে হবে? অবশ্যই আমি আপনার সাথে থাকা ছাড়া অন্য কিছু ভাবছি না।'[৪৭]

অর্থাৎ তিনি অল্পবয়সি হওয়া সত্ত্বেও বললেন—আমার কাউকে জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজন নেই। এই ব্যাপারে মা-বাবার কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই বেছে নিলাম। তিনি এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এক মুহূর্তও সময় নিলেন না। তবে তিনি এখানে ঈর্ষার কারণে একটি সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করলেন।

---

[৪৬] বুখারি : ৪৭৮৬

[৪৭] বুখারি : ৪৭৮৬

সে সুযোগটা কী? সেটা হলো—এখন অন্য স্ত্রীরা যেতে চাইলে চলে যাক। এজন্য আয়িশা (রা.) বললেন—

> 'হে রাসূলুল্লাহ! আপনি কাউকে বলবেন না, আমি আপনার সাথে থাকতে ইচ্ছে করেছি। তাঁদের মনে করতে দিন, আমি অন্য কিছু ইচ্ছে করেছি।'

সত্যি বলতে আয়িশা (রা.) এটা মন থেকেই চাইতেন। আগেই বলেছি, এই বিষয়গুলো আমরা উপেক্ষা করে থাকি। তবে এগুলো এমন কিছু না, যেগুলো ঈমানের ক্ষতি করে। এগুলো হলো প্রাকৃতিক অনুভূতি। যাহোক, আয়িশা (রা.)-এর প্রস্তাবের জবাবে রাসূল ﷺ বললেন—

> 'না, যদি তাঁদের কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে, তবে সত্যটাই বলব।'

অর্থাৎ আমি এটা করতে পারব না। যদি তাঁদের কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে, তাহলে বলব—'আয়িশা আল্লাহকে বাছাই করেছে। কারণ, আল্লাহ আমাকে কোনো জিনিস কঠিন করার জন্য প্রেরণ করেননি; বরং সবকিছু সহজ করার জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাকে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। অর্থাৎ আমাকে এটা করতেই হবে।'

রাসূল ﷺ আরও বললেন—

> 'এখন আদর্শবান ব্যক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করার সময়। আমি এমন নীচ ধরনের কাজ করতে পারি না। আল্লাহ আমাকে কোনো জিনিসকে কঠিন করার জন্য প্রেরণ করেননি। অন্য স্ত্রীদেরও নিজ নিজ অধিকার রয়েছে। কেবল তুমি এটা চাও বলে মনে করার কারণ নেই যে, অন্যদের থাকার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ আমাকে কোনো জিনিসকে কঠিন করার জন্য প্রেরণ করেননি; বরং সহজ করার জন্য প্রেরণ করেছেন। আর মানবজাতির শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছেন।'

এ ঘটনা পাঠ করে আমাদের মধ্যে আয়িশা (রা.) সম্পর্কে খানিকটা নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু এটা একেবারেই কাম্য নয়। কারণ, তিনি এমন একজন ব্যক্তি; যিনি নিজেই এটা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, অথচ এই ঘটনার সঙ্গে তিনিই জড়িত। বয়স্ক ও পরিপক্ব জ্ঞানে উপনীত

হওয়ার পর তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজের ঘটানো কিছু ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। তিনি আমাদের বলেছেন—

> 'আমি রাসূল ﷺ-কে বলেছি—"আপনি আপনার অন্য স্ত্রীদের বলবেন না।" এই কথা একটু অন্যরকম ভাব প্রকাশ করে, তাই রাসূল ﷺ আমাকে সংশোধন করে দিয়েছেন—"না, যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে, তাহলে আমাকে সত্য কথা বলতে হবে। আমি তাঁদের সত্য বলব। কেননা, এটা তাঁদের অধিকার। আমি মিথ্যা বলব না। কারণ, আমি এমন কাজ করে নীচ হতে চাই না। আল্লাহ আমাকে এমন কিছু করতে বলেননি। যদি তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করে, তাহলে আমাকে ন্যায়সংগত ও যথাযথ তথ্য তুলে ধরতে হবে।"'

এ ছাড়া আরও একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে। এটাও মানবীয় অনুভূতির বর্ণনা। আমাদের মানবীয় অনুভূতি সম্পর্কে বেশি পড়া উচিত না। মনে আছে, আয়িশা (রা.)-এর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিলেন? হ্যাঁ, জয়নব (রা.)। একদিন রাসূল ﷺ-এর কিছু মেহমান আয়িশা (রা.)-এর বাড়িতে এলেন। রাসূল ﷺ তাঁদের সাথে বসে কথা বলছিলেন বা অন্যকিছু করছিলেন। আয়িশা (রা.) তখন পর্দার আড়ালে। এমন সময় জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) রাসূল ﷺ ও তাঁর মেহমানদের জন্য প্লেটে করে কিছু খাবার পাঠালেন। কিন্তু রাসূল ﷺ তখন ছিলেন আয়িশা (রা.)-এর ঘরে। এমন পরিস্থিতিতে অন্য স্ত্রীর পক্ষে মেহমানদের কিছু দেওয়া অবশ্যই অনুমোদনযোগ্য। কিন্তু আয়িশা (রা.) এখানে দ্বিগুণ সমস্যা অনুভব করলেন। তিনি মনে করলেন—এখানে জয়নব (রা.)-এর খাবার পাঠানোর অর্থ হলো আমাকে এই বার্তা দেওয়া যে, তুমি যথাযথ আপ্যায়ন করতে পারছ না, তাই আমাকে আপ্যায়ন করতে দাও।

এই ভেবে খুব রেগে গেলেন আয়িশা (রা.) এবং মেহমানরা পর্দার পেছন থেকে প্লেট ভাঙার শব্দ শুনতে পেলেন। প্লেটটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু রাসূল ﷺ তাঁর মেহমানদের সাথেই বসে থাকলেন। সুবহানাল্লাহ! রাসূল ﷺ এতে চোখের একটি পলকও ফেললেন না। তিনি কেবল এতটুকুই বললেন—'তোমাদের মা একটু ঈর্ষা দেখাচ্ছে।'[৪৮]

---

[৪৮] বুখারি : ৫২২৫

তিনি তাঁর সমালোচনা করলেন না, এমনকি রাগও হলেন না। আয়িশা (রা.)-কে একটি কথাও বললেন না। কারণ, এটা হচ্ছে মানবীয় অনুভূতি। উলটো রাসূল ﷺ বাকি খাবারটুকু উঠিয়ে নিলেন। কেননা, রাসূল ﷺ কখনো খাবার ফেলে দিতেন না। তাই মেঝে থেকে সবকিছু উঠিয়ে নিলেন এবং যতটুকু উদ্ধার্য খাবার, সেটা গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি আয়িশা (রা.)-এর থেকে একটি থালা নিলেন এবং সেটা জয়নব (রা.)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

অর্থাৎ ফয়সালাটা এমন যে, এটা তোমার ভুল হয়েছে, তাই সে একই ধরনের একটি থালা পাবে।

সুবহানাল্লাহ! কত সুন্দর একটি আধ্যাত্মিক ও নীতিমূলক ঘটনা। এটা রাসূল ﷺ-এর জীবনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা কেবল তাঁর শানেই গেয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয়, আমাদের কেউ হলে স্ত্রীর সাথে তৎক্ষণাৎ চিৎকার-চ্যাচামেচি শুরু করে দিতাম যে—'তুমি সবার সামনে আমাকে অপমান করেছ! তোমার এত বড়ো সাহস!' আরও কত কিছু। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর পক্ষে এটা খুবই নগণ্য বিষয় ছিল। তিনি আমাদের মতো করেননি। তবে আয়িশা (রা.) যেহেতু অন্য একজনের সম্পদ ভেঙেছিলেন এবং বিষয়টি অনুচিত ছিল, তাই জয়নব (রা.)-কে তাঁর একটি থালা জরিমানা দিতে হলো। এই ফয়সালা অত্যন্ত সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য। একদিকে জয়নব (রা.) তাঁর ক্ষতিপূরণ পেলেন, অন্যদিকে খাবারও নষ্ট হলো না। রাসূল ﷺ খাবারগুলো উঠিয়ে নিয়েছিলেন। এটা আমাদের জন্য সুন্নাহ, যদি কোনো খাবার পড়ে যায় তাহলে সেটা সবটুকু উঠিয়ে নেওয়া এবং সেখান থেকে খাওয়া।

এই ঘটনা আমাদের কাছে আয়িশা (রা.)-এর ঈর্ষা এবং রাসূল ﷺ-এর পরিপক্ব স্বভাবের চিত্র প্রকাশ করছে। স্ত্রীদের মাঝে যে দ্বন্দ্বগুলো থাকে, সেগুলোতে আমাদের পুরোপুরি না জড়ানো এবং নবিজির মতো একজন পরিপক্ব নেতাকে অনুসরণ করা উচিত।

আয়িশা (রা.)-এর ঈর্ষা আরও কয়েকটি ঘটনায় দেখা যায়। এর মধ্যে বনু মুসতালিকের ঘটনাটি অনেক প্রসিদ্ধ। জুয়াইরিয়া (রা.)-এর বিবাহের সময় আয়িশা (রা.) তাঁর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। বাড়ির পর্দাটা এমন ছিল, যা সরিয়ে তিনি মানুষদের দেখতে পেতেন, কিন্তু মানুষ তাঁকে দেখতে পেত না।

কারণ, সেখানে হয়তো-বা অন্ধকার বা এমন কিছু ছিল, যা ভেতরে দেখতে বাধা প্রদান করত।

আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস যখন কয়েদিদের পক্ষ থেকে মিনতি নিয়ে আসে, তখন আমি পর্দাটা সরাই। আমি তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে আগে থেকেই অবগত ছিলাম। তাই তাঁকে দেখামাত্রই ঈর্ষা করতে শুরু করলাম। কারণ, আমি জানতাম, রাসূল ﷺ সেটাই দেখবেন—যা আমি তাঁর মধ্যে দেখেছি।'[৪৯]

অর্থাৎ তিনি একজন অবিবাহিত যুবতি ও সুন্দরী নারী। রাসূল ﷺ তাঁকে দেখলে বলবেন—আমি তোমাকে বিবাহ করব এবং তোমার গোত্রের মুক্তির ব্যবস্থা করব। আর এ চিন্তা নিয়েই সে মুক্তির জন্য এসেছিল। আর আমরা জানি, রাসূল ﷺ সত্যিই তাঁকে বিবাহ করেছিলেন এবং পুরো বনু মুসতালিক গোত্রকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আমরা পরে কোনো একসময় এই ঘটনা আলোচনা করব। এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো—আয়িশা (রা.) এখানেও ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। পরে তিনি এটা স্বীকারও করেছিলেন, যখনই আমি তাঁকে দেখলাম, ঈর্ষা করতে শুরু করলাম।

এই ঘটনা কেবল জুয়াইরিয়া (রা.)-এর সাথেই ঘটেনি; বরং সাফিয়া (রা.)-এর সাথেও ঘটেছিল। যখন তাঁরা খায়বার থেকে মদিনার দিকে আসছিলেন, তখন রাসূল ﷺ সাফিয়া (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই ঘটনাটিও আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

> 'যখন তাঁরা এলো, আমি ছদ্মবেশ ধারণ করলাম এবং নিজেকে আবৃত করে ফেললাম। আমি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লাম, যাতে সাফিয়াকে দেখতে পাই।'

অর্থাৎ তিনি আগত স্ত্রীদের পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এরপর তিনি বলেন—

> 'আমি দেখতে চাইলাম, তিনি দেখতে কেমন।'

এজন্য তিনি কাপড় বা অন্য কিছু পরিধান করেছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন—

> 'রাসূল ﷺ তখনও চোখ দেখে আমাকে চিনতে পেরেছিলেন।'

---

৪৯ كتاب أم المؤمنين جويرية بنت الحارث - برة الأسيرة، পৃ.-৭

অথচ তখন তিনি পুরো নিকাব পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। আর আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন না, যখন এমন কোনো সমাজে বসবাস করবেন, যেখানে সকল নারী নিকাব পরিহিত অবস্থায় থাকবে, তখন সেখানে চোখ দেখেই নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারবেন। আমি নিজে এক দশকের বেশি সময় এমন পরিবেশে ছিলাম। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, যদি হেরেম শরিফ থেকে ১০ হাজার মহিলাও একসঙ্গে আসে, তারপরও ওই মুহূর্তে আমি নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারব। আর সেজন্য আপনাকে অবশ্যই এ ধরনের পরিবেশে থাকতে হবে; অন্যথা প্রথম সপ্তাহে গেলে মনে হবে, সকলেই দেখতে একরকম। যখন ওই সমাজে বসবাস করবেন, তখন চোখ দেখেই পরিচয় বলে দিতে পারবেন।

আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'তিনি আমাকে চোখ দেখে চিনতে পেরেছিলেন; যদিও আমি অন্যরকম কাপড় পরিহিত অবস্থায় ছিলাম, যাতে করে নিজেকে আবৃত করতে পারি।'

কেন তিনি ছদ্মবেশে ছিলেন? কারণ, তিনি চাননি রাসূল ﷺ এটা জানুক, তিনি সাফিয়া (রা.)-কে পর্যবেক্ষণ করছেন। আয়িশা (রা.) যখন ফিরে এলেন, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন—'কী দেখলে?'

আয়িশা (রা.) ঈর্ষা নিয়ে বললেন—'আমি ইহুদিদের মধ্য থেকে একজন ইহুদিকে দেখছিলাম।'[৫০]

উল্লেখ্য, সাফিয়া (রা.) ছিলেন একজন ইহুদি। আয়িশা (রা.) এই কথা বলার মাধ্যমে মূলত এটা বোঝাতে চাচ্ছিলেন, সাফিয়া কে—এটা নিয়ে তিনি পরোয়া করেন না। তাঁকে কেবল একজন ইহুদি হিসেবেই তিনি গণ্য করেন; এর বেশি কিছু নয়।

এখানেও মানবীয় অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। আয়িশা (রা.)-এর ঈর্ষা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, রাসূল ﷺ কখনো কখনো এর দ্বারা বিরক্ত হতেন। কারণ, অন্য স্ত্রীরাও এই বিষয়টিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, রাসূল ﷺ কখনো স্ত্রীদের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোতে নাক গলাতেন না। এটা রাসূল ﷺ-এর পরিপূর্ণতাকে প্রকাশ করে।

---

৫০ صفية بنت حيي - كتاب الإصابة في تمييز الصحابة ইবনে হাজার আসকালানি, পৃ.-২১১

প্রকৃতিগতভাবে আয়িশা (রা.)-এর ঈর্ষা ভাবটা তাঁকে এমন কিছু করতে বাধ্য করত, যা সম্ভবত খুব বেশি যথাযথ ছিল না। যদিও এজন্য তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে, তবুও বিষয়টা যথাযথ ছিল না। আর এই বিষয়টাই রাসূল ﷺ-কে বিরক্ত করেছিল।

এটার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উদাহরণটা ঘটেছিল রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের ১০ দিন পূর্বে। রাসূল ﷺ আয়িশা (রা.)-এর সাথে একই বিছানায় শায়িত ছিলেন। এমন সময় জিবরাইল (আ.) তাঁর কাছে এলেন। আর জিবরাইল (আ.) রাসূল ﷺ-এর কাছে তখনই আসতেন, যখন তিনি আয়িশা (রা.)-এর বিছানায় থাকতেন। অন্য কোনো স্ত্রীদের বিছানায় থাকলে তিনি সাধারণত আসতেন না। জিবরাইল (আ.) তাঁকে বললেন—

> 'আল্লাহ আপনাকে জান্নাতুল বাকিতে গিয়ে সালাম দিতে বলেছেন।'[৫১]

এটা যেহেতু রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের ১০ অথবা সাত দিন পূর্বের ঘটনা, তাই তখনও তাঁর জ্বর তীব্র আকার ধারণ করেনি। এটা তাঁর জীবনের অন্যতম একটি শেষ কাজ ছিল। তিনি জিবরাইল (আ.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী গভীর রাতে জান্নাতুল বাকিতে গিয়েছিলেন। আপনারা হয়তো এ ঘটনা জানেন।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে—জিবরাইল (আ.) এমন সময় তাঁর কাছে ওহি নিয়ে এলেন, যখন তিনি আয়িশা (রা.)-এর পাশে শুয়ে ঘুমাচ্ছেন। তাই ওহি শোনার পর তিনি শান্তভাবে কাঁথাটা ওঠালেন। তারপর দরজাটা খুললেন এবং জুতা পরলেন। উদ্দেশ্যে ছিল, একদম শান্তভাবে চলে যাবেন। কেন? কারণ, তিনি আয়িশা (রা.)-কে জাগাতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু আয়িশা (রা.) উঠে গেলেন।

আশা করি বুঝতে পারছেন—যখন তিনি রাসূল ﷺ-কে খুব শান্তভাবে বাড়ির বাইরে যেতে দেখলেন, তখন কী ভেবেছিলেন! তাঁর চিন্তা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল! রাসূল ﷺ যখন জান্নাতুল বাকির দিকে চলতে শুরু করলেন, তখন আয়িশা (রা.)-ও তাঁর পিছু নিলেন।

---

[৫১] মুসলিম : ৯৭৪

আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'আমি চাদর পরিধান করলাম এবং তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। যতক্ষণ না আমি নিশ্চিত হই, তিনি জান্নাতুল বাকিতে গিয়েছেন। তারপর তিনি পেছনে আসতে শুরু করলেন এবং আমিও পেছনের দিকে যেতে শুরু করলাম। কিন্তু তিনি এবার আমার দিকে অগ্রসর হলেন আর আমি তাঁর সাথে প্রতিযোগিতা করতে লাগলাম। অবস্থা এমন হলো যে, আমাকে ফিরে আসার জন্য দৌড়াতে হলো।'

কেন? কারণ, রাসূল ﷺ খানিক দূরে কিছু একটা দেখেছিলেন এবং চিন্তা করছিলেন—'এ কে?' তবে তিনি ভাবেননি যে, তিনি আয়িশা (রা.) হতে পারেন। কারণ, তাঁকে ঘুমের অবস্থায় রেখে রাসূল ﷺ এখানে এসেছেন। তাই এই ছায়াটিকে চিহ্নিত করার জন্য তিনি দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন। সুবহানাল্লাহ! এ রকম মধ্যরাতেও তাঁর কোনো ভয় ছিল না। এত গভীর রাতেও তিনি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি যে আমাদের প্রিয় রাসূল ﷺ! একটু চিন্তা করে দেখুন তো, এরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের কী অবস্থা হতো!

মধ্যরাতে তিনি একটি কালো ছায়াকে এদিক-সেদিক ঘুরতে দেখলেন, অমনি তার পরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্য পিছু নিলেন এবং দৌড়াতে লাগলেন। ফলে আয়িশা (রা.)-ও দৌড়াতে লাগলেন, যতক্ষণ না তিনি বাড়িতে এসে পা দেন। আর আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'আমি তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়ি, কিন্তু কিছুতেই আমার শ্বাসক্রিয়া থামাতে পারছিলাম না।'

তিনি ভেবেছিলেন, রাসূল ﷺ-কে বোকা বানিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু যখন রাসূল ﷺ ভেতরে এলেন, তখন তাঁর জোরে জোরে শ্বাস নেওয়া দেখে বুঝে ফেললেন। রাসূল ﷺ বললেন—'তাহলে তুমিই ছিলে সেই ব্যক্তি!' আয়িশা (রা.) প্রাথমিকভাবে না বোঝার ভান করে বললেন—'কোনটা, কোনটা?' কিন্তু একটু পরেই তিনি স্বীকার করে নিলেন। আর ঘটনাটা একটু জটিল। তাই রাসূল ﷺ বিরক্ত হয়ে বললেন—

> 'তুমি কি মনে করো যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার সঙ্গে প্রতারণা করবে?'

এই ঈর্ষা তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তা একেবারেই যুক্তির বাইরে চলে গিয়েছিল।

এজন্য রাসূল ﷺ তাঁকে বলেছিলেন—

> 'এটা করা আমার জন্য বৈধ নয়, মধ্যরাতে আমি অন্য স্ত্রীর ঘরে চলে যাব। আজকে তোমার অধিকার, তোমার রাত। আমি এমন কিছু করব না, যাতে মনে হতে পারে—আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার সঙ্গে প্রতারণা করছে।'[৫২]

এখানে রাসূল ﷺ-এর বিরক্ত হওয়ার পেছনে যৌক্তিক কারণ ছিল। এই অসন্তোষের জন্য আয়িশা (রা.)-কে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।

এই ধরনের আরও একটি উদাহরণ রয়েছে, যেখানে রাসূল ﷺ-এর পেছনে দৌড়ানোর মতো অবস্থা হয়নি, তবুও প্রায় একই রকম। মুসলিমে আছে, আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'একদিন আমি ঘুম থেকে উঠে পড়ি। দেখি, আমার সামনের বিছানা খালি। এই গভীর রাতে তিনি কোথায় গেলেন, এই ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। আমার চারপাশে হাত নাড়িয়ে খোঁজার চেষ্টা করলাম, তিনি কোথাও আছেন কি না। অবশেষে আমি রাসূল ﷺ-এর পা সিজদারত অবস্থায় অনুভব করলাম। তিনি সিজদায় পড়ে দুআ পড়ছিলেন যে—"হে আল্লাহ! আমি আপনাকে সেই পরিমাণ সম্মান দিতে পারি না, যে পরিমাণ সম্মানের আপনি যোগ্য। কেবল আপনিই আপনার সম্মানের যোগ্য।"'[৫৩]

তখন আয়িশা (রা.) বললেন—

> 'আমার মা-বাবাকে আপনার জন্য কুরবান হোক। আমার চিন্তা একদিকে, আর আপনার চিন্তা অন্যদিকে।'

তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁর ঈর্ষা একটু বেশি। তবে আমি আগেও বলেছি এবং বলতেই থাকব, এগুলো নিয়ে স্টাডি করার প্রয়োজন নেই। তাঁকে এগুলোর জন্য ক্ষমা করা হয়েছে।

---

৫২ মুসলিম : ৯৭৪

আরও একটি উদাহরণ আছে, যেখানে তাঁর আবারও ঈর্ষার প্রকাশ ঘটে। এই ঘটনায় আল্লাহ নিজে হস্তক্ষেপ করে এই ব্যাপারে আয়াত নাজিল করেছিলেন। এটাও একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা, যা আবার সেই জয়নব (রা.)-এর সাথেই ঘটেছিল।

রাসূল ﷺ-এর একটা অভ্যাস ছিল—তিনি যখন রাতে অবসর হতেন, তখন এক এক করে সকল স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আর যার ঘরে তিনি রাত্রিযাপন করবেন, তাঁর সাথে সবার শেষে সাক্ষাৎ করতেন।

একদিন জয়নব (রা.) কিছু মধু উপহার পান। আর সকলেই জানতেন, রাসূল ﷺ মধু পছন্দ করতেন। রাসূল ﷺ যখন জয়নব (রা.)-এর ঘরে গেলেন, স্বাভাবিকভাবেই তিনি মধু পান করলেন। আর মধু খেতে এবং উপভোগ করতে তো একটু সময় লাগেই। তাই তিনি সাধারণ সময়ের চেয়ে সেখানে একটু বেশি সময় কাটালেন। ধরুন যে দুই মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট।

আর এটিই আয়িশা (রা.)-কে খুব বেশি বিরক্ত করল। অর্থাৎ এই কয়েক মিনিটের জন্যও তিনি খুব ঈর্ষান্বিত হলেন। তাই একটি পরিকল্পনা এঁটে ফেললেন। সাথে নিলেন হাফসা (রা.)-কে। এটি এমন একটি বিখ্যাত ঘটনা, যেটা সম্পর্কে আমরা প্রায় সকলেই জানি। কিছু বর্ণনায় রয়েছে, তিনি আরও তিন অথবা চারজন উম্মুল মুমিনিনকে এর সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু মূল পরিকল্পনায় ছিলেন আয়িশা (রা.) ও হাফসা (রা.)।

এ কারণে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে দুজনের কথা উল্লেখ করেছেন। আয়িশা (রা.) ছিলেন মূল, আর হাফসা (রা.) ছিলেন তাঁর সাথি। তাঁরা কয়েকজন স্ত্রীর ঘরে গিয়েছিলেন নিজ দলে শামিল করানোর জন্য। তাঁদের মূল পরিকল্পনাটি ছিল—পরেরবার যখন জয়নব (রা.)-এর পালা আসবে, (তাঁরা জানতেন, এর পরেরবারও রাসূল ﷺ সেখানে মধুর কারণে বেশি সময় কাটাবেন) প্রত্যেক স্ত্রী সেদিন বলবে—'আপনি কী খেয়েছেন? আপনার মুখ থেকে অনেক বাজে গন্ধ আসছে।'

রাসূল ﷺ তাঁর চেহারা, মর্যাদা ও গন্ধের ব্যাপারে ছিলেন খুবই সচেতন। তাই যখন তাঁর একাধিক স্ত্রী একই কথা বললেন এবং শেষে আয়িশা (রা.)-ও বললেন—'আপনি বাজে কিছু খেয়েছেন। এমন কিছু দ্বিতীয়বার খাওয়া আপনার উচিত হবে না।' তখন রাসূল ﷺ প্রভাবিত হলেন এবং জবাবে বললেন—'আমি আর কখনো জয়নবের দেওয়া মধু খাব না।'[৫৪]

---

[৫৪] ফাতহুল বারি, কিতাবুত তালাক, খণ্ড-৯, পৃ.-২৯০

অর্থাৎ এর মাধ্যমে তিনি জয়নব (রা.)-এর প্রতি দোষারোপটাকে সত্য বলে মেনে নিলেন। বিশ্বাস করলেন—জয়নব তাঁকে খারাপ কিছু দিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা সূরা তাহরিমের প্রারম্ভের দিকটা নাজিল করলেন। আপনারা আয়াতগুলো পড়তে পারেন, এগুলো আমাদের জন্য নিয়ামত। আল্লাহ তায়ালা সেখানে বলেছেন—

> إِنْ تَتُوْبَآ إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا-
>
> 'তোমাদের উভয়কেই আল্লাহর কাছে অনুতাপ করতে হবে।'[৫৫]

এই আয়াতগুলো একটু ছোটো ছিল; বলতে পারেন একটু কঠোর ছিল। সেখানে আল্লাহ তাঁদের বলছেন—'তোমরা এমন ধরনের খেলা খেলতে পারো না।'

অর্থাৎ তোমরা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে এমন চাল চালতে পার না। কারণ, তাঁর মর্যাদা অনেক ওপরে। সূরা তাহরিমে স্পষ্টভাবে আয়াতগুলো আছে, আপনারা পড়ে নিতে পারেন।

একটি হাদিসে রাসূল ﷺ আয়িশা (রা.)-কে বললেন—

> 'আমি জানি কখন তুমি আমার সাথে রাগ হও, আর কখন খুশি হও।'
>
> তিনি বললেন--'কীভাবে?'
>
> রাসূল ﷺ বললেন—'যখন তুমি আমার সাথে খুশি থাক, তখন এই বলে কসম করো—"আমি মুহাম্মাদের খোদার কসম করে বলছি।" আর যখন রাগ হও, তখন এই বলে কসম করো—"আমি ইবরাহিমের খোদার কসম করে বলছি।" তখন আমার নাম উল্লেখ করো না।'
>
> এটা শুনে আয়িশা (রা.) একটু হেসে দিলেন এবং বললেন—"হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ঠিক বলেছেন। কিন্তু আমি শুধু আপনার নামটাই উল্লেখ করি না।"[৫৬]

অর্থাৎ নাম উল্লেখ না করলেও ভালোবাসা বন্ধ হয়ে যায় না। 'মুহাম্মাদ' তো শুভ একটা নাম। এটা মুখে নিই আর না নিই আমার ভালোবাসা সব সময়ই থাকবে। এই ঘটনা প্রকাশ করে দেয়, রাসূল ﷺ আয়িশা (রা.)-কে কত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন।

---

[৫৫] সূরা তাহরিম : ৪

এ ছাড়া অন্য একটি ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, রাসূল ﷺ-এর কোনো স্ত্রীর জন্য কেবল মালা দিয়েই নিজেকে অলংকৃত করা যথোপযুক্ত ছিল।

বুখারিতে এসেছে—

> 'একদিন রাসূল ﷺ এসে দেখলেন, আয়িশা (রা.) রুপার বালা পরেছেন। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি বললেন—"এটা কী?"'

প্রশ্ন করার কারণ হলো, তিনি ঘরে খুব বেশি স্বর্ণ ও রুপা রাখতে চাইতেন না। সাদামাটা জীবনযাপন করতেই পছন্দ করতেন। আর নবিজি জানতেন, এটা তিনি কিনে দেননি। আয়িশা (রা.) বললেন—

> 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! এগুলো আমি এনেছি, যাতে আপনার কাছে নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারি। আপনার জন্য নিজেকে অলংকৃত করতে চাই, যাতে আপনার ভালো লাগে।'

কিন্তু রাসূল ﷺ-এর চিন্তার সৌন্দর্য ছিল আরও মহিমান্বিত। তিনি চিন্তা করছিলেন, এই স্বর্ণ বা রুপার জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাই তিনি বললেন—

'তুমি কি এটার জন্য কোনো জাকাত আদায় করেছ?'

আয়িশা (রা.) বললেন—'না, আমি জাকাত দিইনি।'

তারপর রাসূল ﷺ বললেন—

> 'যদি জাকাত না দাও, তবে এটা তোমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। স্বর্ণ ও রুপার ওপর তোমাকে অবশ্যই জাকাত দিতে হবে।'[৫৭]

এখানে বিষয়টা হলো, রাসূল ﷺ অর্থের ব্যাপারে স্বতন্ত্র পর্যায়ে বাস করতেন। সেখানে তাঁর জন্য প্রয়োজন ব্যতীত স্বর্ণ ও রুপা ঘরে রাখা উচিত ছিল না। এটাই ছিল রাসূল ﷺ-এর মনোভাব। কিন্তু আয়িশা (রা.) এভাবে চিন্তা করতেন না। তিনি চিন্তা করতেন সেভাবে, যেভাবে আর দশটা নারী চিন্তা করে। এ রকম করা তাঁর জন্য ছিল খুবই স্বাভাবিক। তিনি নবিজির জন্য নিজেকে অলংকৃত করতে চেয়েছিলেন।

---

[৫৭] আবু দাউদ : ১৫৬৫

এ ছাড়াও একটি ঘটনা আছে। আয়িশা (রা.)-এর ভাতিজা কাসেদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর। মুহাম্মাদ ছিলেন আবু বকরের ছেলে। তাই কাসেদ ইবনে মুহাম্মাদ তাঁর ভাতিজা হবেন। তিনি কোনো সাহাবি ছিলেন না। নিশ্চিতভাবে রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই রাসূল ﷺ-এর সাক্ষাৎ পাননি। তিনি সম্ভবত বসরায় একটি দলের সঙ্গে ছিলেন এবং নিজেরাই নিজেদের ওপর একটি মাসয়ালা নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। তাঁরা বলতেন, নারীদের জন্য লাল কাপড় পরিধান করা বৈধ নয়। কারণ, সেই সময় লাল রং মহিলাদের জন্য একটি সুন্দর রং হিসেবে বিবেচিত ছিল। এমনকি আজকের দিনেও লালকে সুন্দর রং হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে আমাদের সংস্কৃতিতে এখন নারীদের কাছে গোলাপি অথবা এই ধরনের রং সেরা হিসেবে বিবেচিত। সত্য বলতে, লাল রং মহিলাদের একটি কমন রং ছিল। তাদের কাছে নারীদের জন্য স্বর্ণ পরা বৈধ ছিল না।

কাসেদ ইবনে মুহাম্মাদ অনেক বছর পর আয়িশা (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—

> 'আমি আমার ফুফু আয়িশা (রা.)-কে সকল ধরনের লাল কাপড় পরতে দেখেছি এবং স্বর্ণ, রৌপ্যসহ অনেক কিছুর অলংকার পরতে দেখেছি (তাঁর দেখার অনুমতি ছিল। কেননা, তিনি ভাতিজা ছিলেন)।'[৫৮]

আয়িশা (রা.) সেই ধরনের কাপড়ই পরতেন, যেগুলো তিনি রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় পরতেন। বিষয়টি হচ্ছে, লাল রং-কে মূলত অলংকারিক ও উজ্জ্বলতার রং হিসেবে ধরা হয়। আর কাসেদ বলছেন—'আমি তাঁকে এই রঙের কাপড় পরতে দেখেছি।'

নিয়ামতপ্রাপ্ত নারী

একটি ঘটনা আছে, যেখানে আমরা আয়িশা (রা.)-এর শক্তিশালী ভালোবাসার প্রমাণ পাই। ঘটনাটি এতটাই শক্তিশালী যে, কখনো কখনো অন্য স্ত্রীও এই ভালোবাসা ব্যবহার করে রাসূল ﷺ-এর সুনজরে আসার চেষ্ট করতেন। রাসূল ﷺ ও সাফিয়া (রা.)-এর মাঝে কিছু ঘটনা ঘটেছিল। আমরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত সাফিয়া (রা.)-এর জীবনী আলোচনার সময় জানব।[৫৯]

রাসূল ﷺ সাফিয়া (রা.)-এর ওপর একটু ব্যথিত ছিলেন। অর্থাৎ তিনি এমন কিছু বলে ফেলেছিলেন, যা বলা উচিত ছিল না। ফলে সাফিয়া (রা.) যখন বুঝতে পারলেন, তখন ক্ষমাপ্রার্থনা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু কীভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন? তিনি একটা বুদ্ধি বের করলেন। আয়িশা (রা.)-এর কাছে গিয়ে বললেন—

'আমি তোমাকে আমার দিনটি দিয়ে দেবো, প্রতিদানে তুমি আমার সম্বন্ধে রাসূল ﷺ-এর কাছে কিছু ভালো কথা বলবে।'

সুবহানাল্লাহ! আমাদের আম্মাজানরা জানতেন, আয়িশা (রা.)-এর মুখের কথা রাসূল ﷺ-এর মনে কী পরিমাণ প্রভাব ফেলে। তাঁর প্রস্তাবটি খেয়াল করুন—

'তোমাকে এই সপ্তাহে আমার ভাগের দিনটা দিয়ে দেবো, তবে শর্ত হলো নবিজির মন থেকে আমার ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব দূর করতে হবে।'

আয়িশা (রা.) বললেন—'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি এটি করে দেবো।'

---

[৫৯] সাফিয়া (রা.)-এর জীবনী পড়তে পড়ুন ইয়াসির ক্বাদির *বিশ্বাসীদের মা* বইটি।

অতঃপর তিনি বললেন—

'আমি একটি গোলাপি রঙের কাপড় পরলাম এবং কিছু সুগন্ধি লাগালাম। অতঃপর রাসূল ﷺ আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তাঁর পাশঘেঁষে বসলাম।'

কিন্তু এই সাক্ষাৎ তাঁর সাথে শেষ হওয়ার কথা ছিল না; বরং এটি সাফিয়া (রা.)-এর সাথে শেষ হওয়ার কথা ছিল।

যেমনটা আপনারা জানেন, এখানে একটি ধারাবাহিকতা আছে। এই রাতের সাক্ষাৎ শুরু হবে আয়িশা (রা.)-এর সাথে এবং শেষ হবে সাফিয়া (রা.)-এর সাথে। কিন্তু আয়িশা (রা.) একদম প্রস্তুত হয়েছিলেন। অবস্থা দেখে রাসূল ﷺ বললেন—

'তুমি এটা কী করছ? তোমার তো আজ এত সুন্দর ও পরিপাটি হয়ে থাকার কথা ছিল না। কেননা, আজকে তোমার রাত না!'

জবাবে আয়িশা (রা.) বললেন—

'এটা হলো আল্লাহর নিয়ামত। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। সাফিয়া (রা.) আমাকে তাঁর রাতটি উপহার দিয়েছেন।'[৬০]

তারপর তিনি পুরো ঘটনা খুলে বললেন। এতে রাসূল ﷺ-এর মনে যে অসন্তোষ ছিল, তা দূর হয়ে গেল। এখানে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো—সাফিয়া (রা.) ছিলেন আয়িশা (রা.)-এর প্রতিদ্বন্দ্বী। তারপরও তিনি জানতেন, যদি আমাকে রাসূল ﷺ-এর ভালো নজরে ফিরে আসতে হয়, তাহলে আয়িশা (রা.)-এর ভালোবাসার পথ দিয়েই যেতে হবে।

আয়িশা (রা.)-এর আরেকটি নিয়ামত ছিল, যা অন্য স্ত্রীদের ছিল না। তা হলো—তিনি জিবরাইল (আ.)-কে সরাসরি দেখেছিলেন; তবে আসলরূপে নয়। কারণ, রাসূল ﷺ ব্যতীত অন্য কেউ তাঁকে আসলরূপে দেখেননি। তিনি জিবরাইল (আ.)-কে দেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর যাওয়ার আগ পর্যন্ত জানতেন না যে, তিনিই জিবরাইল (আ.)। এ রকম ঘটনা বহুবার ঘটেছিল। আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন—

> 'একদিন রাসূল ﷺ-কে খানিকটা দূরে একজন সুদর্শন ব্যক্তির সাথে কথা বলতে দেখলাম। যখন তিনি আমার কাছে এলেন,

---

৬০ মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খণ্ড-৪, পৃ.-৩২১

> তখন বললাম—"ওই সুদর্শন লোকটি আপনার কাছে কী চাইছিলেন?" এমন লোক সাধারণত এতদূর থেকে শহরে এসে নবিজির সাথে কথা বলতেন না। নবিজি বললেন—"তুমি কি তাঁকে দেখেছ?" আয়িশা (রা.) বললেন—"হ্যাঁ, আমি তাঁকে দেখেছি।" তারপর তিনি বললেন—"তিনি কোনো সুদর্শন ব্যক্তি নন; বরং তিনি হলেন জিবরাইল (আ.)।'[৬১]

আর ফেরেশতারা মানুষের কাছে তখনই দৃশ্যমান হন, যখন আল্লাহ চান। এখানে কোনো কিছুই অপ্রত্যাশিতভাবে হয়নি; বরং আল্লাহ চেয়েছেন, আয়িশা (রা.) জিবরাইল (আ.)-কে দেখুক। অন্যথায় এ রকম কখনোই ঘটত না। অন্যদিকে সকল সাহাবির মাঝে দাহইয়া কালবি (রা.)-কে সুদর্শন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তিনি হচ্ছেন সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন। আর ফেরেশতারা হলেন একটি সুন্দর সৃজন। তাই তাঁরা যখন মানুষের রূপ ধরে আসেন, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই খুব সুন্দর হয়ে যান। আর তাঁরা যদি অচেনা হিসেবে আসতেন, তাহলে অদ্ভুতই দেখাত। এজন্য আয়িশা (রা.) অচেনা হিসেবে দেখে চিন্তিত হননি। কারণ, তিনি তাঁকে একজন মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি জানতেন না যে, সুদর্শন ব্যক্তিটি কোনো মানুষ নন; বরং জিবরাইল (আ.)।

এ ছাড়া আরও একটি ঘটনা আছে, আয়িশা (রা.) ও রাসূল ﷺ ঘরে একসঙ্গে বসে আছেন। এমন সময় রাসূল ﷺ বললেন—

> 'হে আয়িশা! জিবরাইল (আ.) এখানে আছেন এবং তোমাকে সালাম দিয়েছেন।'[৬২]

আমরা আগেই বলেছি, জিবরাইল (আ.) রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে কেবল আয়িশা (রা.)-এর ঘরেই আসতেন। আয়িশা (রা.) উত্তর দিলেন—'ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।'

তারপর তিনি বললেন—'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা যা দেখতে পারি না, আপনি তা পারেন।' আয়িশা (রা.) তখন জিবরাইল (আ.)-কে দেখতে পাননি। তখন পুরো ঘরটিই একদম ফাঁকা দেখাচ্ছিল। অথচ সেখানে জিবরাইল (আ.) এসেছিলেন এবং আয়িশা (রা.)-কে সালাম দিয়েছিলেন।

---

৬১ سلسلة الأحاديث الصحيحة পৃ.-১০৫
৬২ তিরমিজি : ৩৮৮২

এখন আপনি খাদিজা (রা.)-এর সাথে এই ঘটনার তুলনা করলে পার্থক্যটি বুঝতে পারবেন। খুব বিস্তারিত বর্ণনায় যাচ্ছি না। কেননা, খাদিজা (রা.)-এর উপমা কেবল তিনি নিজেই। তাঁকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে সালাম পাঠিয়েছিলেন। জিবরাইল (আ.) নিজে থেকে সালাম দিয়েছেন। এখানে সুস্পষ্ট একটা পার্থক্য রয়েছে। আরেকটি বিষয় হলো—জিবরাইল (আ.) আয়িশা (রা.)-কে সরাসরি তাঁর উপস্থিতিতে সালাম জানিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা শুনতে পাননি। তাই জিবরাইল (আ.) রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দেন।

এ ছাড়া আরেকটি নিয়ামত আছে, যেটা অনেক প্রসিদ্ধ। যখন আপনি আয়িশা (রা.)-কে নিয়ে কথা বলবেন, তখন তায়াম্মুমের বিষয়টি আপনা থেকেই সামনে চলে আসবে। কেননা, তায়াম্মুমের জন্য মা আয়িশা (রা.)-কেই কৃতিত্ব দেওয়া হয়। সর্বদাই এটিকে বিবেচনা করা হয় একটি নিয়ামত হিসেবে। আর এই নিয়ামতটা সম্ভব হয়েছিল কেবল তাঁর জন্যই। এ ঘটনাটিও অনেক প্রসিদ্ধ। বহু হাদিসগ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। ঘটনাটি হচ্ছে—

> ‘এক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় আয়িশা (রা.) তাঁর পছন্দের হারটি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বিষয়টি তিনি রাসূল ﷺ-কে জানালেন। রাসূল ﷺ বললেন—“ঠিক আছে, আমরা এটি খুঁজে বের করব।”’

এটা অবশ্যই একটি বড়ো ব্যাপার। কারণ, সবার সমান মর্যাদা ছিল না। যদি অন্য কারও হার হারিয়ে যেত, তাহলে হয়তো সৈন্যরা খুঁজতেন না। কিন্তু যেহেতু রাসূল ﷺ বলেছেন, তাই সেটি খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি যাবেন না। আর রাসূল ﷺ না গেলে তাঁরাও যেতে পারবেন না। তাই পুরো সৈন্যবাহিনী হারটি খুঁজতে শুরু করল, তা ছাড়া তাঁদের দ্রুত সময়ের মধ্যেই মদিনায় ফিরে যেতে হবে। কেননা, মদিনা যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা যে খাবার-পানি সঙ্গে এনেছিলেন, তা শেষ হতে মাত্র এক দিন বাকি।

> ‘হাতে যে সময়টুকু ছিল, তাতে হারটি আর খুঁজে পাওয়া গেল না। এদিকে কাফেলার পানি শেষ। অবশ্য তাঁরা সঠিক পরিকল্পনাই করেছিলেন। কিন্তু যাত্রাপথে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে অতিরিক্ত পানিটুকুও শেষ হলো। পান করার মতো সামান্য কিছু পানি রইল বটে, কিন্তু তা অজু-গোসল করার মতো পর্যাপ্ত ছিল না।’

প্রসঙ্গক্রমে যেমনটা আমরা জানি, ওই হারটি ছিল আয়িশা (রা.)-এর উটের নিচে। এটা মূলত ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। তারপর উটটি সেটার ওপর বসে পড়ে। এদিকে পুরো সৈন্যবাহিনী হারটি খুঁজতে থাকে, কিন্তু হারটি উটের নিচে থাকায় তাঁরা খুঁজে পাননি। তাঁরা যখন খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত, তখন উটটি দাঁড়িয়ে গেল। আর তখনই হারটি চোখে পড়ল। এটাই হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ এমনটিই ঘটাতে চেয়েছিলেন। এ সবকিছুই ছিল আল্লাহর পরিকল্পনা।

> 'সৈন্যরা যখন হারটি পাচ্ছিল না, তখন কিছু লোক আবু বকর (রা.)-এর কাছে নালিশ করলেন—"দেখুন আপনার কন্যা কী করেছেন! তাঁর কারণে আমরা বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি করে ফেলেছি। কারণ, তিনি তাঁর হার ঠিকমতো রাখেননি। বিলম্বের কারণে আমাদের পানি শেষ হয়ে গিয়েছে। আপনার মেয়ে রাসূল ﷺ-কে অসুবিধায় ফেলেছে। তাঁর কারণেই আমাদের সবাইকে এখানে থাকতে হলো।"
>
> এ কথা শুনে আবু বকর (রা.) আয়িশা (রা.)-এর ওপর বিরক্ত হলেন এবং তাঁর তাঁবুর দিকে ছুটলেন। গিয়ে দেখলেন যে, রাসূল ﷺ তাঁর কোলে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। তাই তিনি উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলে নিচু গলায় আয়িশা (রা.)-এর ওপর রাগ ঝাড়তে লাগলেন—"দেখো তুমি কী করেছ?" (ঠিক একজন বাবা যেভাবে নিজের মেয়েকে শাসন করে থাকেন। বাবা হিসেবে তাঁর এ অধিকার ছিলই।)
>
> তিনি ফিসফিস করে বললেও আওয়াজ ঠিকই বেড়ে যাচ্ছিল। একপর্যায়ে তিনি আয়িশা (রা.)-এর পেটে খোঁচা দিলেন, কিন্তু আয়িশা (রা.) কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। এই ঘটনা সম্পর্কে আয়িশা (রা.) বলেন—
>
> "আমার প্রতিহত না করা এবং পেছনে সরে না আসার একমাত্র কারণ হলো, রাসূল ﷺ-এর মাথা আমার কোলে ছিল। আমি চাচ্ছিলাম না তাঁর ঘুম ভেঙে যাক।"
>
> এদিকে আবু বকর (রা.) বলেই যেতে থাকলেন—"তোমার জন্যই সবকিছু হয়েছে।"'

তবে আবু বকর (রা.)-এর এমন মন্তব্যে কোনো ঘৃণা ছিল না; কেবল বিরক্তি ছিল। ব্যাপারটা এমন ছিল—'তুমি হারটি ঠিকমতো রাখতে পারোনি,

তাই আল্লাহর রাসূলকে বিলম্ব করতে হলো! তুমি রাসূল ﷺ-কে অসুবিধায় ফেলে দিয়েছ! তোমার জন্য সবাইকে বিলম্ব করতে হচ্ছে। আমাদের কাছে এখন পানিও নেই। কী করব আমরা এখন?'

> 'সুবহানাল্লাহ! যখন উটটি উঠল, তাঁরা হারটি খুঁজে পেল। এদিকে নামাজের সময় হয়ে এলে দেখা গেল, সেখানে অজু করার মতো কোনো পানি নেই। কিন্তু নামাজ তো পড়তে হবে! এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা তায়াম্মুমের ব্যাপারে সূরা মায়েদায় আয়াত নাজিল করলেন—
> "যদি তোমার কাছে পানি না থাকে, তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নাও।"'

এই তায়াম্মুম কিয়ামত পর্যন্ত যে কারও জন্য প্রযোজ্য হবে, যদি পানি শেষ হয়ে যায়। এই ব্যাপারটি সাহাবিদের এতটাই খুশি করেছিল যে, তাঁরা ভবিষ্যতের সফরে আর কখনো পানি নিয়ে চিন্তা করতেন না। কেননা, তাঁরা যেকোনো অবস্থায় তায়াম্মুম করতে পারতেন।

> 'আয়াত নাজিল হওয়ার পর উবায়দা (রা.) আবু বকর (রা.)-কে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন—"আপনার ও আপনার পরিবারের পক্ষ থেকে এটাই প্রথম কৃপা নয়; (এর আগেও) আমাদের আরও অনেক কৃপা দিয়েছেন। আর এটিও অন্যতম একটি কৃপা, যা আপনার পরিবারের জন্যই এলো।"'[৬৩]

এটা অনেক বড়ো একটি কৃপা ছিল। কারণ, মরুভূমিতে পানি খুবই দুষ্প্রাপ্য, যদিও আমাদের ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন। কারণ, আমরা তায়াম্মুম খুব কম করে থাকি। কিন্তু তাঁদের জন্য ছিল এটা অনেক বড়ো একটি কৃপা। এখন থেকে পানি শেষ হয়ে গেলে এটা নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না। তাঁরা তায়াম্মুম করে নিতে পারবেন। তাই সকলেই খুব খুশি হলেন।

এ ছাড়াও আয়িশা (রা.)-এর তাকওয়া, দান-সাদাকার ব্যাপারে আরও অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। আমরা কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করব।

---

[৬৩] বুখারি : ৪৬০৭; মুসলিম : ৩৬৭

তাকওয়া ও ঈমান

এমন অনেক ঘটনা আছে, যেগুলো আয়িশা (রা.)-এর উচ্চ পর্যায়ের তাকওয়া ও ঈমানের ব্যাপারে বর্ণনা করেছে। তাঁর মধ্যে মুসলিমে একটি হাদিস আছে—

> 'রাসূল ﷺ-এর একটি মাদুর বা জায়নামাজ ছিল, যেটার ওপর তিনি নামাজ পড়তেন। তিনি আয়িশা (রা.)-কে বললেন—"আমাকে জায়নামাজটি দাও।" আয়িশা (রা.) বললেন—"হে আল্লাহর রাসূল! আমি হায়েজ অবস্থায় আছি।"'[৬৪]

জায়নামাজটি তখন মসজিদে ছিল। নারী ও মসজিদ নিয়ে যে একটি সমস্যা আছে, এই হাদিসটি তার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ। হাদিসটি একদম সহিহ। এ হাদিসটির শব্দগুলোকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

আয়িশা (রা.) হায়েজ অবস্থার দ্বারা যা বোঝাতে চেয়েছিলেন, তা হলো—আপনার জায়নামাজ আনার জন্য মসজিদের ভেতর পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে পারব না (কেননা, আমি অপবিত্র অবস্থায় আছি)। এটা হচ্ছে অধিকাংশের অভিমত। আরেকটি অভিমত রয়েছে, যেটি এই ব্যাপারে অন্য একটি ব্যাখ্যা প্রদান করে। 'নারীরা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে'—যারা এই মতের পক্ষে, তারা এই ব্যাখ্যাটি দিয়ে থাকেন।

আয়িশা (রা.)-এর মন্তব্যে রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন—'মাসিক তো তোমার হাতে নেই।'[৬৫]

---

[৬৪] মুসলিম : ২৯৮; আবু দাউদ : ২৬১

[৬৫] মুসলিম : ২৯৮; আবু দাউদ : ২৬১

অর্থাৎ তোমার কাছে এটাই চাচ্ছি যে, একটু ঢুকে জায়নামাজটিকে একটু টান দিয়ে বের করে নাও। কারণ, দরজাটা ছিল মূলত আড়াআড়িভাবে। রাসূল ﷺ যখন নামাজ পড়তেন, তখন পর্দার ওই পাশে চলে যেতেন। আয়িশা (রা.) একটু ঢুকেই এটিকে আনতে পারতেন। কিন্তু বিষয়টি হলো, তিনি ছিলেন সচেতন। তিনি যেহেতু মাসিক অবস্থায় আছেন, তাই মনে করলেন, তাঁর মসজিদের ভেতরে যাওয়া উচিত হবে না।

এটাই তাঁর সচেতনতার প্রমাণ। একই সাথে এটাও প্রমাণ করে, তিনি সাধ্যমতো ইসলামি নীতিমালা অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন।

মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে বুখারি শরিফে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ হাদিস বর্ণিত আছে। তা হলো, মাসিকের দিন একজন নারী কীভাবে পোশাক পরে এবং কাজ করে তা যদি আয়িশা (রা.) দেখতেন, তাহলে তাদের মসজিদে আসার জন্য নিষেধ করতেন। আর তাঁর মধ্যে নিয়মের ক্ষেত্রে কঠোর হওয়ার প্রবণতা ছিল।

এ ছাড়া আরও একটি ঘটনা সহিহভাবে বর্ণিত আছে—

> 'রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের এক বছর পর হজ করেছিলেন। তিনি দিনের বেলায় তাওয়াফ করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, যখন বেশিরভাগ মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছিল এবং কেবল ছোটো একটি দল তাওয়াফ করছিল। তারপরও তিনি একদম বাইরের দিকে গিয়ে তাওয়াফ করলেন। অতঃপর তাঁর নারী দাসী বলল—"হে মা আয়িশা! চলুন আমরা কালো পাথরকে চুম্বন করতে ভেতরে যাই।" তিনি বললেন—"আমি কখনোই সেখানে যাব না এবং পুরুষদের সঙ্গে মিশ্রিত হব না।"'[৬৬]

যদিও সেটা একটি ছোটো দল ছিল এবং এখনকার মতো তখন কিছুই ছিল না। এ ছাড়া আরও একটি ব্যাপার চিন্তা করে দেখুন, যদি তাওয়াফকারীরা শুনত যে সেখানে আম্মাজান আয়িশা (রা.) আসছেন, তখন তারা কী করত? তারা কি সেখানে থাকত? সবাই একদম থেমে যেত না? বরং এমন হতো, সবাই বলত—'তাঁকে আগে যেতে দিন, তাঁকে আগে যেতে দিন।' তারপরও অতিরিক্ত সচেতনতা এবং আলাদা থাকার জন্য তিনি কালো পাথরকে স্পর্শ ও চুম্বন করতে গেলেন না। কেবল মধ্যরাতে একদম বাইরের দিক থেকে

---

৬৬ বুখারি ।

তাওয়াফ করলেন—যাতে করে কারও কাছাকাছি যাওয়ার মতো সমস্যা তৈরি না হয়।

এ ছাড়া বুখারিতে আরেকটি হাদিস আছে—

> একবার আয়িশা (রা.)-এর পালনকারী মামা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুমতি চাইলেন। অর্থাৎ যেই মহিলা আয়িশা (রা.)-কে লালন-পালন করেছিলেন, সাক্ষাতের আবেদনকারী ব্যক্তি মূলত তাঁর ভাই। তাঁরা আয়িশা (রা.)-কে একজন সন্তান হিসেবেই জানতেন। কিন্তু আয়িশা (রা.) বললেন—"যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূল ﷺ আমাকে অনুমতি দেন, ততক্ষণ আমি সাক্ষাৎ করতে পারব না।"
>
> তিনি ছিলেন একজন বৃদ্ধ লোক; যিনি শুরু থেকেই পারিবারিকভাবে তাঁদের খুব কাছের। অথচ আয়িশা (রা.) বললেন—"না, যতক্ষণ না আমি রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হই, ততক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষাৎ করতে পারব না।" তারপর তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। জবাবে রাসূল ﷺ বললেন—"তিনি তোমার লালন-পালনকারী মামা।"
>
> এতে আয়িশা (রা.) বললেন—"হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে পালন করেছেন তো ওই মহিলা; যিনি আমাকে দুধ পান করিয়েছিলেন, কিন্তু এই ব্যক্তি না। (অর্থাৎ আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছি)।' তখন রাসূল ﷺ বললেন—"তিনি তোমার মামা, তিনি প্রবেশ করতে পারবেন।"'

আপনি যেমনই অনুভব করুন না কেন, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তাঁর মামাই। কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে, তিনি এ ব্যাপারে খুব সচেতন ও সতর্ক ছিলেন। এ ঘটনাটি অনেক প্রসিদ্ধ। রাসূল ﷺ ও আবু বকর (রা.) ইন্তেকালের পর আয়িশা (রা.) স্বাভাবিকভাবেই বাড়িতে থাকতেন। আর তাঁদের কবরগুলো ছিল তাঁর পাশেই। উমর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর কেবল উমর (রা.)-এর সম্মানের স্বার্থেই তিনি পর্দার পেছন থেকে বাইরে এলেন। যদিও তা একটা মৃতদেহ ছিল, তারপরও তিনি পুরোপুরিভাবে হিজাব ও নিকাবের মধ্যে থেকেই বের হয়েছিলেন। যদিও ইসলামি শরিয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে কবরের সামনে নিকাব পরতে হবে না। কিন্তু যেহেতু তিনি উমর (রা.)-কে জানতেন, তাই তাঁর কবরের সামনে এসে একটু বেমানান অনুভব করছিলেন। সুবহানাল্লাহ! এটা পুনরায় আয়িশা (রা.)-এর অতিরিক্ত সচেতনতার দিকটাই প্রকাশ করে।

আয়িশা (রা.) ও পবিত্র কুরআন

আয়িশা (রা.) সম্পর্কিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে—আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আয়াত নাজিল করেছেন। বুখারিতে উল্লিখিত হাদিসে এসেছে, আয়িশা (রা.) বলতেন—

> 'আমি খুবই সম্মানিত। কারণ, আল্লাহ তায়ালা আমার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন।'[৬৭]

আয়িশা (রা.) মাঝে মাঝে নিজেকে নিয়ে ভাবতেন—

> 'আমি কে? আমার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করলেন! আর আল্লাহ তায়ালা তা কতই-না সুন্দর ভাষায় উপস্থাপন করেছেন!'[৬৮]

আল্লাহ তায়ালা আয়িশা (রা.) সম্পর্কে বলেছেন—

> الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ-
>
> 'মুহসানাত, গাফিলাতুল মুমিনাত অর্থাৎ সচ্চরিত্র ও নিষ্পাপ মুমিন (বিশ্বাসী) নারী।'[৬৯]

আল্লাহ আয়িশা (রা.)-এর শানে অত্যন্ত চমৎকার শব্দমালা চয়ন করেছেন। এরপর বলেছেন—'মুহসানাত' অর্থাৎ সতীত্ব রক্ষাকারী বা চরিত্রবান নারী। 'গাফিলাত' বা নির্দোষ নারী। অর্থাৎ খারাপ কিছু হতে অন্যমনস্ক নারী। এখানে গাফিলাতের যথার্থ মানে হলো—এমন নারী; যিনি মন্দ কিছু শোনা, বলা ও ধারণা করা থেকে গাফিল। অর্থাৎ যে সকল নারী পরিশুদ্ধ করেছে নিজেদের অন্তরকে, তাঁরা মন্দ কিছু চিন্তা করে না। আর এটাই নেককার নারীদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাদের হৃদয় ও মন খুবই পবিত্র। মুনাফিকরা যেসব মন্দ কথা বলত, তারা তা চিন্তাও করতে পারে না। ফলে আয়িশা (রা.) বুঝতেই পারেননি, তারা মূলত কী বলছে (কেননা, তিনি সকল প্রকার মন্দ বিষয় থেকে গাফিল)। এখানে গাফিলাত শব্দ দ্বারা এ ধরনের নির্দোষ ও অন্যমনস্কতাকে বোঝানো হয়েছে। আর এমন বৈশিষ্ট্যের নারীরা অবশ্যই মুমিনা।

---

[৬৭] ফাতহুল বারি : খণ্ড-৭, পৃ.-৪৯৭

[৬৮] বুখারি : ৭৫৪৫

হুমায়রা

আয়িশা (রা.)-এর একটি ডাকনাম ছিল ‘হুমায়রা’। নবিজি ভালোবেসে তাঁর জন্য একটি ডাকনাম নির্দিষ্ট করেছিলেন। আয়িশা (রা.) এটা ভেবে মন খারাপ করতেন যে, তাঁর কোনো ডাকনাম নেই। এজন্য নবিজি তাঁকে বললেন—‘তুমি হচ্ছ উম্মে আবদুল্লাহ।’[৭০] তবে এটি তাঁর ডাকনাম নয়।

মানুষ ভালোবাসার কাউকে সম্বোধন করতে সুন্দর ও প্রিয় ডাকনাম রাখে। আর তাদের মধ্যকার ভালোবাসার ভাব বিনিময় করতে এ নাম ব্যবহার করে। এ ধরনের ভালোবাসার নিদর্শন প্রতিটি সংস্কৃতি ও সভ্যতায় আছে। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.)-এর ডাকনাম ছিল ‘হুমায়রা’। হুমায়রা শুরু হয়েছে আরবি ‘হা’ বর্ণ দিয়ে এবং শেষে রয়েছে আরবি বর্ণ ‘হামজা’। যার অর্থ—টুকটুকে লাল। নবিজি সম্বোধনের মাধ্যমে তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য বর্ণনা করতে এভাবে ডেকেছেন—‘ওরে আমার লাল টুকটুকে হুমায়রা!’ বিভিন্ন হাদিসে এ ডাকনামের উল্লেখ রয়েছে। নাসায়িতে বর্ণিত হয়েছে—

> ‘আবিসিনিয়ার লোকেরা কুস্তি খেলা চর্চা করছিল। তখন নবিজি আয়িশা (রা.)-কে ডেকে বললেন—“হুমায়রা! তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও?”
> “হ্যাঁ! আমি এই সুপ্রসিদ্ধ খেলাটি দেখতে চাই।”
> আয়িশা (রা.) বলেন—“এরপর আমি নবিজির পেছনে গালের সাথে গাল লাগিয়ে দাঁড়ালাম। আসলে আমি খেলা দেখতে আগ্রহী

---

[৭০] আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, হাদিস : ৪৯৭০

> ছিলাম না। আমি শুধু যাচাই করছিলাম, তিনি আমাকে কতটা ভালোবাসেন। আমার খুশির জন্য কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকেন। তা ছাড়া আমি অন্যদেরও এটা দেখাতে চাচ্ছিলাম যে, তিনি আমাকে কত বেশি ভালোবাসেন!"'[৭১]

এ হাদিসের মাধমে আমরা জানতে পারি, রাসূল ﷺ তাঁকে হুমায়রা বলে সম্বোধন করতেন।

মুস্তাদরাকে হাকিমে উল্লিখিত একটি হাদিসে এসেছে—

> 'একদা আলি (রা.) ও আয়িশা (রা.) দুজনেই নবিজির কক্ষে বসে ছিলেন। এ সময় নবিজি বললেন—"এমন একদিন আসবে, আমার কতিপয় স্ত্রী (উম্মুল মুমিনিন) যুদ্ধাভিযানে নেতৃত্ব দেবে।"
> "(সাধারণত নারীরা যুদ্ধাভিযানে নেতৃত্ব দেন না। ফলে আয়িশা রা. হাসলেন।) কি! নারীরা যুদ্ধাভিযানের নেতৃত্ব দিতে পারে?"
> "হে হুমায়রা! সতর্ক থাকো। কেননা, এটি সম্ভবত তুমি!"
> তারপর নবিজি আলি (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন—"তুমি যদি কখনো তাঁকে (আয়িশা রা.-কে) পরাজিত করো, তবে তাঁর সাথে ভদ্রতার পরিচয় দিয়ো।"'[৭২]

এ হাদিসের বিশুদ্ধতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে, তবে সার্বিক বিবেচনায় এ হাদিসটি সহিহ বলে প্রতীয়মান হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

এ হাদিসেও আমরা লক্ষ করলাম, নবিজি অমায়িক ও সুন্দরভাবে আয়িশা (রা.)-কে সম্বোধন করলেন। তাঁর ডাকনামে সম্বোধন করে বললেন—'হে হুমায়রা! এটা সম্ভবত তুমি হবে।'

আর ইতিহাসের মাধ্যমে জানা যায়, পরবর্তী সময়ে এমনটাই ঘটেছিল উষ্ট্রের যুদ্ধে। এ যুদ্ধে আলি (রা.) ও উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.) ছিলেন পরস্পরের প্রতিপক্ষ। নবিজি আলি (রা.)-কে বলেছিলেন—'তুমি যদি কখনো তাঁকে (আয়িশা রা.-কে) পরাজিত করো, তবে তাঁর সাথে ভদ্রতার পরিচয় দিয়ো।'

আর উষ্ট্রের যুদ্ধে এমনটাই ঘটেছিল (অর্থাৎ আলি রা. তাঁর প্রতি ভদ্র ও সম্মানজনক আচরণ করেছিলেন)।

আরবের সকল নারী ও উম্মুল মুমিনিনের মধ্যে আয়িশা (রা.) ছিলেন সবচেয়ে জ্ঞানী। ফিকহ ও হাদিসের জ্ঞানসহ ধর্মতত্ত্বে ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। ছিলেন বহুসংখ্যক হাদিসের বর্ণনাকারী। সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী চারজন সাহাবির মধ্যে আয়িশা (রা.) ছিলেন অন্যতম।

জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা

আয়িশা (রা.) নবিজির থেকে ২২০০-এরও অধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে ২৬৮টি। ইমাম বুখারি ও মুসলিম যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন ১৪৭টি। ইমাম বুখারি এককভাবে বর্ণনা করেছেন ৫৪টি। আর ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন ৫৮টি। এই হিসেবে বুখারিতে সর্বমোট ২২৮টি এবং মুসলিমে ২৩২টি হাদিস আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর অবশিষ্ট হাদিসগুলো হাদিসের অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদের ৬ষ্ঠ খণ্ডে ২৫৩টি পৃষ্ঠা শুধু আয়িশা (রা.)-এর হাদিস বর্ণনা করেছেন।

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.)-এর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ছিল অনেক বেশি। নবিজির জীবদ্দশায়ই তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর মনে উদিত হতো বিভিন্ন সুগভীর প্রশ্ন। অসাধারণ ছিল তাঁর বিশ্লেষণী শক্তি। ছিলেন বুদ্ধিমতী ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ একজন নারী। এর উদাহরণ হিসেবে বুখারির একটি হাদিস উল্লেখ করা যাক—

> ‘একবার নবিজি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন— فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا আবার নবিজি অন্য একটি বিখ্যাত হাদিসে বলেছিলেন—“আল্লাহ যাকেই হিসাব দেওয়ার জন্য বলবেন, তাকেই শাস্তি পেতে হবে।”’

অর্থাৎ আল্লাহ যদি আপনার হিসাব নেন, তবে শাস্তি পেতেই হবে। সুতরাং আয়িশা (রা.) নবিজির তিলাওয়াতের মাঝখানে বলে উঠলেন—

> 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তায়ালা কি পবিত্র কুরআনে বলেননি—فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا অর্থাৎ তিনি বান্দার হিসাব সহজ করে দেবেন?'''

লক্ষ করুন, তাৎক্ষণিকভাবে তিনি পবিত্র কুরআনের সাথে হাদিসের সংযোগ স্থাপন করে বললেন—

> 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি একদা বলেছেন, মান হুসিবা উজ্জিব (আল্লাহ যাকেই হিসাব দেওয়ার জন্য বলবেন, তাকেই শাস্তি পেতে হবে), তাহলে এই আয়াতের ব্যাখ্যা আমরা কীভাবে বুঝব?'

নবিজি বললেন—

'মূলত এ আয়াতটি বর্ণনা দিচ্ছে, হাশরের দিন বান্দার হিসাব কেমন হবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বান্দাকে কড়ায়-গন্ডায় হিসাব দিতে বলবেন, তখন তাকে শাস্তি পেতেই হবে।'[৭৩]

এভাবে নবিজি তাঁকে দেখালেন, কীভাবে ফিকহ প্রয়োগ করতে হয়। এ হাদিসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, আয়িশা (রা.) পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত সম্পর্কে নবিজিকে প্রশ্ন করতেন এবং তার মর্মার্থ বুঝে নিতেন। এর আরেকটি উদাহারণ হলো—নবিজি পবিত্র কুরআনের সূরা মুমিনুন থেকে তিলাওয়াত করছিলেন—

> وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ 'আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে তাঁরা মানুষকে দান করে। আর তাঁদের হৃদয় হয় প্রকম্পিত।'

অর্থাৎ তাঁরা দান-সাদাকা করেও ভীত ও প্রকম্পিত অনুভব করে। আয়িশা (রা.) তখন নবিজিকে জিজ্ঞেস করলেন—

> 'হে আল্লাহর রাসূল! এ মানুষগুলো কারা, যারা দান করার সময় তাঁদের হৃদয় কাঁপতে থাকে? তাঁরা কি মদপান করে ও যিনায় লিপ্ত হয়?'

নবিজি বললেন—

> 'হে বিনতে সিদ্দিক! না, এ আয়াত দ্বারা এমন লোকদের বোঝানো হচ্ছে না; বরং বোঝানো হচ্ছে—যারা রোজা রাখে, সালাত আদায় করে, অর্থাৎ যারা উত্তম মানুষ। আসলে দান করার সময় তাঁরা এ ভয় করে যে, এগুলো যদি আল্লাহ কবুল না করেন!'[৭৪]

অর্থাৎ এমন লোকদের কথা এই আয়াতে বলা হচ্ছে, যারা ভালো কাজ করেও আল্লাহকে ভয় করে, আমলের কবুলিয়্যাত নিয়ে ভীত থাকে।

এ উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, আয়িশা (রা.) পবিত্র কুরআনের আয়াতের মর্মার্থ জানতে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন, যা আয়িশা (রা.)-এর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। এজন্যই পরবর্তী সময়ে তাঁকে বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসের মর্মার্থ জানতে জিজ্ঞেস করা হতো এবং প্রশ্ন করা হতো বিভিন্ন ফিকহি মাসয়ালার বিষয়ে; ইসলামি ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে।

এ ছাড়াও মদিনার অ্যাকাডেমিক সার্কেলে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিলেন আয়িশা (রা.)। যদিও তিনি কখনো জনতার সামনে হাজির হতেন না; পরিপূর্ণ পর্দা পালনের মাধ্যমে (পর্দার আড়াল থেকে) ছাত্রদের শিক্ষা প্রদান করতেন। তিনি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন। ইলম অর্জনের জন্য বা কোনো বিষয়ে মাসয়ালা জানার জন্য কিংবা ফতোয়ার জন্য সাহাবিরা তাঁর কাছে বার্তাবাহক পাঠাতেন। আবার কখনো তাঁরা আয়িশা (রা.)-কে সরাসরি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। নবিজির অন্য কোনো স্ত্রী এ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। অর্থাৎ তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য প্রশ্ন করা হতো না। তাঁরা ফতোয়াও প্রদান করতেন না।

আয়িশা (রা.)-এর বুদ্ধিমত্তার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.)-এর ভাগনে ছিলেন উরওয়া। উরওয়া জীবনের শেষ দিকে মদিনার ফকিহ হন। এটা সে সময়ের ঘটনা উল্লেখ করছি, যখন তিনি ছিলেন একজন সাধারণ ছাত্র। উরওয়া একটি ফতোয়া প্রদান করলেন—

> 'যারা হজ পালন করবে, তাদের সায়ি করার প্রয়োজন নেই।'

---

৭৪ তিরমিজি : ...

উরওয়া কর্তৃক প্রদান করা ফতোয়া ছিল পবিত্র কুরআনের আয়াত—

> إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
>
> 'নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া (পাহাড় দুটি) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কাবাগৃহে হজ ও উমরা সম্পন্ন করে, তার জন্য এ (পাহাড়) দুটি প্রদক্ষিণ (সায়ি) করলে কোনো পাপ নেই।'[৭৫]

উরওয়া এই আয়াত থেকে বুঝেছিলেন, আল্লাহ শুধু বলেছেন—'যদি কেউ সাফা ও মারওয়া সায়ি করে, তবে তার কোনো পাপ নেই।' আল্লাহ তো বলেননি যে এটি করা ওয়াজিব।

আয়িশা (রা.)-তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করে বললেন—'এ ফতোয়া সঠিক নয়।'

মূলত এ আয়াতের প্রেক্ষাপট হলো—সায়ি করা জাহেলি যুগে হজের রীতি ছিল বলে সাহাবিরা সায়ি করা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, হয়তো সায়ি করাটাও প্যাগান ধর্মকর্মের অন্তর্ভুক্ত। সেখানে দুটি মূর্তিও ছিল। সায়ি করার মাধ্যমে এ দুটি মূর্তির উপাসনা হয়ে যাওয়ার ভয় করছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। তখন মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দিলেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ি করায় কোনো পাপ নেই। এটাই হলো এই আয়াতের মূল বিষয়বস্তু। ফলে তিনি বলেন—'হে উরওয়া! তোমার ফতোয়া ঠিক নয়।'[৭৬]

এভাবে আয়িশা (রা.) এ ফতোয়া ঠিক করে দেন। কারণ, তিনি এ আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট জানতেন।

আয়িশা (রা.)-এর ফতোয়া প্রদান সম্পর্কে আরেকটি উদাহরণ—

একদিন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)-এর একটি ফতোয়া সম্পর্কে শুনতে পারলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) তাঁর স্ত্রীদের বলেছেন, গোসল করার সময় যেন তাঁরা সমস্ত চুল খুলে ধৌত করে। আয়িশা (রা.) এটা জানতে পেরে বললেন—

---

[৭৫] সূরা বাকারা : ১৫৮

[৭৬] আবু দাউদ : ১৯০১

> 'কী অদ্ভুত ফতোয়া তিনি দিচ্ছেন! আমি নবিজির সাথে একই পাত্রে একসঙ্গে গোসল করেছি। তখন আমি মাথায় তিনবার পানি দিয়েছি, চুলের বাঁধন না খুলেই।'[৭৭]

সুতরাং এ ঘটনা থেকে প্রাপ্ত ফিকহি মাসয়ালা হলো, গোসল করার সময় নারীদের চুলের বাঁধন খুলে ধৌত করা আবশ্যক নয়। তাদের চুলের বেণি খুলতে হবে—এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তবে মাথার চুলের গোড়া ভিজতে হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) ফতোয়া দিয়েছিলেন, তাদের চুলের বাঁধন খুলতে হবে। জবাবে আয়িশা (রা.) বলেছেন—'আমি আপনার থেকে ভালো জানি। নবিজির সাথে গোসল করার সময় তিনি আমার গোসল করা দেখেছেন। তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন। আমরা একই পাত্রে গোসল করছিলাম। আমি মাথায় তিনবার পানি দিয়েছি (চুলের বাঁধন না খুলেই)।' এভাবে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর দেওয়া ফতোয়া সংশোধন করেন।

একইভাবে তিনি ইবনে উমর (রা.)-এর একটি ফতোয়া শুনেছিলেন তা হলো—'ইহরামের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম।'

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.) এই ফতোয়া শুনে বললেন—'আমি ইহরামের পূর্বে নবিজিকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি।'

এ থেকে প্রাপ্ত ফিকহি সিদ্ধান্ত হচ্ছে—ইহরামের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাহ। এ ফিকহি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে আয়িশা (রা.)-এর বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী। এ হাদিসের রাবি আয়িশা (রা.) ফতোয়া দিচ্ছেন—

> 'আমি ইহরামে যাওয়ার পূর্বে নবিজির শরীরে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি। নবিজি তাঁর শরীরে সুগন্ধি নিয়ে ইহরামে গিয়েছেন (তবে ইহরাম বাঁধার পর সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না)।'[৭৮]

আরেকবার তিনি একজন সাহাবির কাছ থেকে ফতোয়া শুনলেন—'স্ত্রীকে চুম্বন করলে অজু ভেঙে যায়।'

---

৭৭ বুখারি : ১/৩১৩; মুসলিম : ৩১৯

তিনি সাহাবির ভুল শুধরে দিয়ে বললেন—'শুধু অজু নয়; নবিজি আমাকে রোজা থাকা অবস্থায়ও চুম্বন করতেন।'[৭৯]

এভাবেই তিনি সাহাবিদের গুরুত্বপূর্ণ ফিকহি বিষয় ও আকিদা শিক্ষা দিতেন।

আরেকটি প্রখ্যাত ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। একবার আবু হুরায়রা (রা.) মসজিদে নববিতে খুতবা দিচ্ছিলেন, আর আয়িশা (রা.) পাশের ঘর থেকে তা শুনছিলেন। আবু হুরায়রা (রা.) খুতবার সময় বললেন—

> 'কেউ যদি রমজান মাসে গোসল ফরজ অবস্থায় ঘুম থেকে জাগে, তবে সে রমজানের রোজা রাখতে পারবে না।'

অর্থাৎ রমজানে আপনি যদি ফজরের পূর্বে ফরজ গোসল না করেন, তবে এর কাজা আদায় করতে হবে। খুতবায় উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্যে দুজন ছিলেন বিখ্যাত তাবেয়ি। এদের একজন আয়িশা (রা.)-এর ঘরে এসে প্রশ্ন করার অনুমতি নিলেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন—'এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?'

আয়িশা (রা.) জবাবে বললেন—

> 'নবিজি রমজান মাসে গোসল ফরজ অবস্থায় জাগ্রত হতেন এবং রমজানের রোজা রাখতেন।'[৮০]

তাবেয়িদ্বয় আবু হুরায়রা (রা.)-এর কাছে গিয়ে আয়িশা (রা.)-এর বক্তব্য পেশ করলেন। তখন আবু হুরায়রা (রা.) বললেন—'আয়িশা (রা.) আমার থেকে ভালো জানেন।' ফলে তিনি তাৎক্ষণিক তাঁর দেওয়া ফতোয়া স্থগিত করলেন।

আয়িশা (রা.) এভাবেই অনেক ফতোয়া শুদ্ধ করে দিতেন, পরিবর্তন করতেন এবং সাহাবিদের শিক্ষা দিতেন।

ইসলামের ইতিহাসে একজন বিখ্যাত মধ্যযুগীয় পণ্ডিত ছিলেন বদরুদ্দিন আজ-জারকাশি (রহ.)। তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন সপ্তম অথবা অষ্টম হিজরি সনে। তিনি *আল ইজাবা ফি মাসতাদরাকাতুল আয়িশাতু আলাস সাহাবার*

---

[৭৯] বুখারি : ১৯২৭, মুসলিম : ১১০৬

[৮০] নাসায়ি : ১৮৩

(আয়িশা (রা.) কীভাবে বোধগম্য উত্তর প্রদানের মাধ্যমে সাহাবিদের শুধরিয়ে দিতেন) শিরোনামে ২০০ পৃষ্ঠার একটি কিতাব লিখেছিলেন। এতে তিনি তুলে ধরেছেন, আয়িশা (রা.) কীভাবে সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিতেন এবং সংশোধন করে দিতেন।

তা ছাড়া সমস্ত সাহাবিরা তাঁর জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। আমাদের নিকট এ সম্পর্কে অনেক বেশি কোড রয়েছে। সুতরাং বুঝতে পারছেন, আয়িশা (রা.) ছিলেন একজন বিজ্ঞ ফকিহা এবং সবচেয়ে জ্ঞানী নারী। নবিজির উম্মতের কোনো নারীই ফিকহ ও আকিদার জ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ হতে পারেনি। কেননা, তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনিন এবং নবিজির জীবনসঙ্গী।

সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী অন্যান্য সাহাবিদের থেকে আয়িশা (রা.)-এর একক বিশেষত্ব হলো, তাঁর প্রায় সবগুলো হাদিসই সরাসরি নবিজি থেকে বর্ণিত। আয়িশা (রা)-এর বর্ণিত হাদিসের দ্বিগুণ বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রা (রা.)। কিন্তু তিনি এর অনেকগুলোই বিভিন্ন সাহাবি থেকে সংগ্রহ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.)ও তাঁর চেয়ে অনেক বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনিও বেশিরভাগ হাদিস অন্যান্য সাহাবি থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। কারণ, নবিজি জীবিতাবস্থায় তিনি ছিলেন বালক। অপর দিকে আয়িশা (রা.) সকল হাদিস সরাসরি নবিজি থেকে বর্ণনা করেছেন।

ফিকহ, তাফসির ও আকিদাগত ইলমের জগতে আয়িশা (রা.)-এর অবদান অসামান্য। তিনি ইসলামি জ্ঞানে দক্ষ নারী হিসেবে যেমন বিখ্যাত ছিলেন, তেমনি বিখ্যাত ছিলেন বাগ্মিতা ও কাব্য প্রতিভায়। আরবি ভাষায় তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল।

সাহাবিদের ভুল সংশোধন

আয়িশা (রা.) বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানে ছিলেন অনন্য উচ্চতায়। হাদিস বর্ণনার পাশাপাশি ফিকহি জ্ঞানেও গভীর দখল। অসংখ্য মানুষ তাঁর থেকে হাদিস ও দ্বীনের পাঠ গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন সময় সাহাবিদের অনিচ্ছাকৃত যেসব ভুল তাঁর গোচরে আসত, তিনি তা হিকমার সাথে শুধরে দিতেন, যাতে উম্মতে মুহাম্মাদি দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ধারণ করতে পারে। এই তালিকায় উমর (রা.)-এর মতো জ্যেষ্ঠ সাহাবিও ছিলেন। সাহাবিগণের ভুল সংশোধনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিম্নে তুলে ধরছি—

আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান বর্ণনা করেন—

> 'আয়িশা (রা.)-এর নিকট খবর এলো—আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন—"মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করার কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়।" আয়িশা (রা.) বলেন—"আল্লাহ তায়ালা আবু আবদুর রহমান (রা.)-কে (আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর ডাকনাম) ক্ষমা করুন। তিনি মিথ্যা বলেননি, কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন বা একটা ভুল করেছেন। সত্য ঘটনা হলো—রাসূল ﷺ একটি ইহুদি মৃত মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন—তারা তার জন্য বিলাপ করছে, আর তাকে তার কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।"'[৮১]

---

[৮১] বুখারি, কিতাবুল জানাইজ, বাবু কওলিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউআজ্জাবুল মায়্যিতু বি বুকাই আলাইহি। মুসলিম, কিতাবুল জানাইজ, বাবুল মাইয়্যিতি ইউআজ্জাবু বি বুকাই আলাইহি।

এটা পরিষ্কার যে, আয়িশা (রা.) এই ক্ষেত্রে ইবনে উমর (রা.)-এর জ্ঞানধারণের যোগ্যতার ব্যাপারে প্রশ্ন উঠিয়েছেন (জব্ত)। এ ব্যাপারে আরেকটি উদাহরণ হলো, যখন আয়িশা (রা.)-এর নিকট বলা হলো—

> 'আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, রাসূল ﷺ বলেন—"শুভ (অশুভ লক্ষণ) রয়েছে তিনটি জিনিসে; ঘর, নারী ও ঘোড়ায়।" আয়িশা (রা.) বলেন—"আবু হুরায়রা পুরো ব্যাপারটি আত্মস্থ করেননি। তিনি ঠিক সে সময় প্রবেশ করেছিলেন, যখন রাসূল ﷺ বলেছিলেন—আল্লাহ ইহুদিদের ধ্বংস করুন। কেননা, তারা বলে—শুভ রয়েছে তিনটি জিনিসে; ঘর, নারী ও ঘোড়ায়। আবু হুরায়রা (রা.) হাদিসটির শেষ অংশ শুনেছিলেন, কিন্তু এর প্রথম অংশ শোনেননি।"'[৮২]

আয়িশা (রা.) একনিষ্ঠভাবে এই নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন। যদি কোনো হাদিস কুরআনের কোনো আয়াতের সাথে বিরোধপূর্ণ হয় এবং কোনোভাবেই দুটিকে এক করা না যায়, তাহলে হাদিস পরিত্যাজ্য হবে; এই নীতি পরবর্তীকালে সকল আইনজ্ঞ ও ঐতিহ্যপন্থিগণ নীতিমালা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং একমত পোষণ করেন।

উদাহরণস্বরূপ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন—'রাসূল ﷺ তাঁর প্রভুকে দুবার দেখেছেন (বাস্তবে চোখ ফেলে)।' মাসরুক বলেন—তিনি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন—'হে উম্মুল মুমিনিন! মুহাম্মাদ ﷺ কি তাঁর রবকে দেখেছেন?'

> তিনি বলেন—'তোমার কথা শুনে আমার চুল খাড়া হয়ে গেছে! তিনটি বিষয় সম্বন্ধে তোমার ধারণা কী? যে এই তিনটি কথা বলে, সে মিথ্যুক—
>
> ১. যে বলে—মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রভুকে দেখেছেন, সে মিথ্যাবাদী। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন—
>
> "দৃষ্টিসমূহ তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তিনিই বরং দৃষ্টিসমূহকে আয়ত্ত করেন। তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী। সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল।"[৮৩]

---

[৮২] মুসনাদে আবি দাউদ আত-তায়ালিসি, দ্র. আল-জারকাশি, আল ইজাবাহ : ৫৯

"কোনো মানুষের মর্যাদা এই নয় যে, আল্লাহ তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন। তিনি কথা বলেন হয় ওহির (ইশারার) মাধ্যমে অথবা পর্দার পেছন থেকে।"[৮৪]

২. যে তোমাকে বলে, সে জানে আগামীকাল কী ঘটবে; সে মিথ্যাবাদী। তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন—

"কোনো প্রাণসত্তা জানে না, আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে।"[৮৫]

৩. যদি তোমাকে কেউ বলে, নবিজি কোনো কিছু লুকিয়েছেন, তাহলে সে মিথ্যাবাদী। তিনি এরপর তিলাওয়াত করেন—

"হে রাসূল! তোমার রবের তরফ থেকে তোমার প্রতি যা কিছু নাজিল হয়েছে, তা লোকদের নিকট পৌঁছে দাও।"[৮৬]

বরং সত্য কথা হচ্ছে—তিনি (ওহির বাহক) জিবরাইলকে তাঁর আসলরূপে দুবার দেখেছেন।"'[৮৭]

উরওয়া ইবনে আল জুবায়ের আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

> 'বদর প্রান্তরে যে গর্তে অবিশ্বাসীদের কবর দেওয়া হয়, রাসূল ﷺ তার কিনারায় দাঁড়িয়ে মৃতদের উদ্দেশে বলেন—"তোমাদের প্রভু যেসব ওয়াদা করেছিলেন, তা কি সত্য পেয়েছ?" তারপর তিনি বলেন—"আমি যা বলছি, তা তারা শুনতে পেরেছে।"'

এই হাদিস যখন আয়িশা (রা.)-কে জানানো হলো, তখন তিনি বললেন—'বরং রাসূল ﷺ বলেছেন—"তারা জানে, আমি যা বলেছি তা সত্য।"'

তারপর তিনি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন—

> 'তুমি মৃতদের শোনাতে পারো না।'[৮৮, ৮৯]

---

[৮৪] সূরা আশ-শূরা : ৫১

[৮৫] লোকমান : ৩৪

[৮৬] সূরা মায়েদা : ৬৭

[৮৭] বুখারি, কিতাবুত তাফসির, বাবু তাফসিরি সূরাতুন-নাজমি

[৮৮] সূরা নামল : ৮০

[৮৯] বুখারি, কিতাবুল মাগাজি, [illegible]

উবায়েদ ইবনে রিফায়া আল আনসারি (রা.) বলেন—

> 'আমরা এক জায়গায় একত্রে বসে ছিলাম। সেখানে জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-ও ছিলেন। লোকজন তখন বীর্যপাতের পর গোসলের আলোচনা করছিল। জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বললেন—"কেউ যদি সংগম করে থাকে আর তার বীর্যপাত না হয়, তাহলে তাঁকে শুধু গোপনাঙ্গ ধুয়ে ফেলতে হবে এবং নামাজের অজুর মতো অজু করতে হবে।" সেখান থেকে একজন এসে এই কথাটি উমর (রা.)-কে বলল। উমর (রা.) বললেন—"তাকে ডেকে নিয়ে এসো এবং আমার সামনে তুমি সাক্ষী থাকো।" লোকটি (জায়েদ রা.-কে) ডেকে নিয়ে এলো।
>
> উমর (রা.)-এর নিকট রাসূল ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবি বসা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আলি ইবনে আবি তালিব ও মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)। উমর (রা.) জায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-কে বললেন—"হে নিজের শত্রু! তুমি কি এমন ফতোয়া দিয়েছ?" জায়েদ (রা.) বললেন—"আল্লাহর কসম! আমি এটা আবিষ্কার করিনি। আমি আমার দুজন চাচা রিফাহ ইবনে রাফি ও আবু আইয়ুব আল আনসারি থেকে শুনেছি।" উমর (রা.) তখন সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরাও এ ব্যাপারে দ্বিমত করলেন। উমর (রা.) বললেন—"হে আল্লাহর বান্দারা! আপনারা আজ দ্বিমত করলেন; অথচ আপনারা বদরের দিন (যুদ্ধে) অংশগ্রহণ করেছিলেন।" তখন আলি (রা.) তাঁকে বললেন—"আপনি কাউকে রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীগণের নিকট পাঠান। কারণ, তাঁরা ব্যাপারটা সম্পর্কে জানতে পারেন।" উমর (রা.) একজনকে হাফসা (রা.)-এর নিকট পাঠিয়ে এ ব্যাপারে জানতে চাইলেন। হাফসা (রা.) বললেন—"এ বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই।" তখন তাঁরা একজনকে আয়িশা (রা.)-এর নিকট পাঠালেন। আয়িশা (রা.) বললেন—"যখন পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ যোনির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তখন গোসল ফরজ।" এরপর উমর (রা.) বললেন—"যদি জানতে পারি, কেউ ওই রকম করার পর গোসল করে না, তবে তাকে সমুচিত শিক্ষা দেবো।"'[৯০]

---

[৯০] শরহু মাআনিল আছার : ৫৮, ইমাম ত্বহাবি

আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান (রা.) বলেন—

> 'আবু হুরায়রা (রা.)-কে একটি ভাষণ দিতে শুনেছি, যখন তিনি বলেন—"কোনো ব্যক্তি যদি গুরুতর নাপাকি অবস্থায় ভোরবেলা ওঠে, তখন তার রোজা রাখা উচিত নয়।" আমি (আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান রা.) তাঁর "রোজা রাখা উচিত নয়" ভাষ্যটি আবদুর রহমান ইবনে হারিসের নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি তাঁর পিতার নিকট তা উল্লেখ করলেন, কিন্তু তিনি তাতে একমত পোষণ করলেন না। তখন আমি ও ইবনে হারিস গিয়ে আয়িশা (রা.) ও উম্মে সালমা (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলাম। আয়িশা (রা.) বললেন—"রাসূল ﷺ ভোরে গুরুতর নাপাকি অবস্থায় উঠতেন এবং রোজা রাখতেন।"'[৯১]
>
> কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণনা করেন, আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, আবু হুরায়রা (রা.) বলেন—'নামাজরত কোনো মানুষের সামনে দিয়ে কোনো নারী গেলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়।' আয়িশা (রা.) বলেন—'একবার রাসূল ﷺ নামাজ আদায় করছিলেন, আমার পা তাঁর সামনে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তিনি আমার পা পেছনের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন আর আমি সঙ্গে সঙ্গে পেছনে সরে এসেছিলাম।'[৯২]

উরওয়া ইবনে আল জুবায়ের বর্ণনা করেন—

'আয়িশা (রা.) জানতে পারেন, আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন—রাসূল ﷺ বলেছেন—"কোনো অবৈধ শিশুকে মুক্ত করার চেয়ে আল্লাহর পথে একটি বেত্রাঘাত মেনে নেওয়া উত্তম।" রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন—"অবৈধ শিশু তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট (পিতা-মাতা-শিশু) এবং মৃত ব্যক্তিকে জীবিতদের বিলাপের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়।" আয়িশা (রা.) বলেন—"আবু হুরায়রাকে আল্লাহ ক্ষমা করুন। তিনি ঠিকমতো শোনেননি, তাই ঠিকমতো উত্তর দিতে পারেননি। তিনি যেমনটা বলেছেন—কোনো অবৈধ শিশু মুক্ত করার চেয়ে আল্লাহর পথে একটি বেত্রাঘাত মেনে নেওয়া উত্তম। এর প্রেক্ষাপট হলো, যখন সূরা বালাদের ১১-১৩ আয়াত নাজিল হলো—

---

[৯১] বুখারি, কিতাবুস সওম, বাবুস-সায়িম ইউসবিহু জুনুবান। মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, বাবু সিহহাতি সাওম মান তলাআ আলাইহিল ফাজরা ওয়া হুয়া জুনুব।

[৯২] ইস্তিদরাকে উম্মুল মুমিনিন : ৯৯, আবু মানসুর আল বাগদাদি

> 'কিন্তু সে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করার সাহস করেনি। তুমি কি জানো সেই দুর্গম গিরিপথটি কী? কোনো গলাকে দাসত্বমুক্ত করা।'

তখন রাসূল ﷺ-কে বলা হলো—"হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের তো মুক্ত করার মতো কিছু নেই। তবে আমাদের কারও কারও ক্রীতদাসী রয়েছে, যারা আমাদের সেবা ও কাজ করে। আমরা বরং তাদের বেশ্যাবৃত্তি করতে বলি। এর মধ্য দিয়ে তাদের যে সন্তান হবে, তাদের আমরা মুক্ত করে দেবো।" তখন রাসূল ﷺ বললেন—"বেশ্যাবৃত্তির আদেশ দেওয়া এবং সেখান থেকে আগত একটি অবৈধ শিশুকে মুক্ত করার আদেশ দেওয়ার চেয়ে আমার জন্য আল্লাহর পথে একটি চাবুকের আঘাত মেনে নেওয়া উত্তম।"'

এরপর আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা—"একটি অবৈধ শিশু তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট—কথাটিও সঠিক নয়।" মূলত হাদিসটি এই ভাষ্যের মতো নয়। একজন মুনাফিক রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দিত। তাই তিনি বললেন—"কে আমাকে তার থেকে রক্ষা করবে?" একজন বলল—"হে আল্লাহর রাসূল! তার ব্যাপারটা হলো, আপনাকে কষ্টকর কথা বলা ছাড়াও সে এক অবৈধ সন্তান।" তখন তিনি বললেন—"সে তিনজনের মধ্যে নিকৃষ্টতম।" আর আল্লাহ বলেন—

> "কেউই অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না।"'[৯৩]

তারপর "মৃত ব্যক্তিকে জীবিত ব্যক্তির বিলাপের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়" মর্মে আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত হাদিসটিও এ রকম নয়; বরং রাসূল ﷺ একজন ইহুদি মৃত ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তার পরিবারের লোকেরা তার জন্য বিলাপ করছিল। তখন তিনি বললেন—"তারা তার জন্য কাঁদছে, আর তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।" আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> "আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বেশি বোঝা দেন না।"'[৯৪, ৯৫]

---

[৯৩] সূরা আনআম : ১৬৪

[৯৪] সূরা বাকারা : ২৮৬

[৯৫] মুস্তাদরাকে হাকিম : ২৩৪

উবাইদ ইবনে উমাইর বর্ণনা করেন—

> 'আয়িশা (রা.) জানতে পারলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) মহিলাদের গোসলের সময় চুলের বেণি খুলে ফেলতে নির্দেশ দিচ্ছেন। আয়িশা (রা.) বলেন—"হায়! তিনি কেন তাদের চুল কামিয়ে ফেলতে বলছেন না!"'[৯৬]

ইয়াহইয়া ইবনে আবদুর রহমান আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন—

> 'তিনি বলেন—"কেউ যদি মৃতকে গোসল করায়, সে যেন গোসল করে। আর যদি কেউ মৃতকে বহন করে, সে যেন অজু করে।"
>
> এ কথা যখন আয়িশা (রা.) জানতে পারলেন, তখন তিনি বলেন—"মৃত মুসলিম কি নাপাক? বহন করাতে কী ক্ষতি থাকতে পারে?"'

কোনো হাদিসকে অসংলগ্ন অর্থ করার আলোকে যাচাই করা

আবু সালামা (রা.) বর্ণনা করেন—

'যখন আবু সাইদ আল খুদরি (রা.) মৃত্যুর নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি নতুন কাপড় আনতে বললেন এবং তা পরিধান করলেন। এই কাজের জন্য যুক্তি হিসেবে তিনি রাসূল ﷺ-এর একটি বাণী স্মরণ করলেন—"আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—মৃত ব্যক্তিকে সেই কাপড়ে ওঠানো হবে, যে কাপড়ে সে মারা যায়।"'

ঘটনাটি যখন আয়িশা (রা.) জানতে পারলেন, তখন তিনি ঘটনার তিরস্কার করে বললেন—'আল্লাহ! আবু সাইদকে দয়া করুন। রাসূল ﷺ পোশাক দ্বারা বুঝিয়েছেন মানুষের অবস্থাকে; যে অবস্থায় সে মারা যায়। কারণ, রাসূল ﷺ বলেছেন—"মানুষকে যেদিন হাশর করা হবে, সেদিন তাকে খালি পায়ে, নগ্ন ও খতনাবিহীন অবস্থায় ওঠানো হবে।"'[৯৭]*

---

[৯৬] মুসলিম, কিতাবুল হায়িদ, বাবু হুকমি দফায়িরিল মুখতাসিলাহ

[৯৭] সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল জানাইজ, বাবু ইউসতাহাব্বু মিন তাতহিরিস সিয়াবিল মাইয়িতি ইনদাল মাউত। আল-জারাকশি, আল ইজাবা : ৭১

* প্রাসঙ্গিক কারণে এই অধ্যায়টি ড. আকরাম নদভীর আল মুহাদ্দিসাত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

আরবের ডাক্তার

আয়িশা (রা.)-কে আরবের ডাক্তার হিসেবে গণ্য করা হতো। লোকেরা তাদের অসুস্থ বাচ্চাদের চিকিৎসার জন্য তাঁর কাছে নিয়ে আসতেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো—'আপনি কীভাবে চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন করেছেন?'

তিনি উত্তর দিলেন—

> 'নবিজির জীবদ্দশায় আরবের বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন তাঁর কাছে আসত। আমি এ প্রতিনিধিদের নিকট থেকে বিভিন্ন ঔষধি গাছের গুণাগুণ সম্পর্কে জেনেছি।'[৭৮]

তিনি একজন রুকইয়াহ বিশেষজ্ঞও ছিলেন। সহিহ বুখারি ও মুসলিমে আয়িশা (রা.) কর্তৃক শিশুদের রুকইয়াহ (একধরনের চিকিৎসা) করার বিবরণ এসেছে। আয়িশা (রা.) এবং কোনো কোনো মাজহাব অনুযায়ী—পবিত্র কুরআনের আয়াত লিখে শিশুদের পরানো বৈধ (চিকিৎসার জন্য)। চিকিৎসার এ পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে আয়িশা (রা.) কুরআন লিখে শিশুদের শরীরে পরাতেন—এটা সুস্পষ্ট। তিনি শিশুদের চিকিৎসায় রুকইয়াহও পাঠ করতেন। যখন তাঁর নিকট অসুস্থ বাচ্চাদের নিয়ে আসা হতো, তখন তিনি মেডিকেল (তৎকালীন হারবাল পদ্ধতি) ও রুকইয়াহ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাতেন।

---

[৭৮] كتاب سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين পৃ.-৩০৩

নবিজির ওফাতের পর আয়িশা (রা.) তাঁর বাড়িতেই মৃত্যু পর্যন্ত বসবাস করেন। আবু বকর (রা.)-এর শেষ জীবনে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছেন উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.)।

আয়িশা (রা.)-এর জ্ঞান-গরিমার কথা বাইরের জগতে প্রকাশ পায় উমর (রা.)-এর শাসনামলে। এ সময়ে তিনি আরও অভিজ্ঞ ও পরিপক্ব হয়ে উঠেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য উমর (রা.) অনেককে আয়িশা (রা.)-এর কাছে পাঠাতেন। আয়িশা (রা.)-এর ফতোয়া অনুযায়ী উমর (রা.) তাঁর শাসনকাজ বাস্তবায়ন করতেন। আমিরুল মুমিনিন উমর ও উসমান (রা.)-এর সময় তিনি দুই থেকে তিনবার হজ পালন করেছেন। তাঁর হজ পালনের সময় বিশেষ ক্যারাভানের ব্যবস্থা থাকত। এতে অন্যান্য উম্মুল মুমিনিনও অংশগ্রহণ করতেন। এ ক্যারাভানের তাঁবু স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা করা হতো বিশেষ জায়গার। তাওয়াফের জন্য আলাদা সময়ের ব্যবস্থা করা হতো। সে সময় অন্য কেউ তাওয়াফ করতে পারত না। তাঁদের ক্যারাভান ছিল বিশেষভাবে সুরক্ষিত। কেননা, তাঁরা ছিলেন উম্মুল মুমিনিন হিসেবে বিশেষ সম্মানের অধিকারী।

একটি মহানুভবতা

নবিজির কবরের পাশে কেবল একটি কবরের জায়গা খালি ছিল। আয়িশা (রা.) ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলেন, এখানেই যেন তাঁর কবর দেওয়া হয়। কিন্তু যখন উমর (রা.) ইন্তেকালের মুহূর্ত এলো, তিনি উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.)-এর নিকট নিজ কবরের জন্য জায়গাটি চাইলেন। আয়িশা (রা.) কবরের জায়গাটি উমর (রা.)-কে দিয়ে দিলেন। বললেন—'উমর (রা.) ছাড়া অন্য কেউ চাইলে কবরের এ স্থানটি আমি দিতাম না।'[৯৯]

আয়িশা (রা.)-এর এ মহানুভবতার কারণে নবিজি, আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর কবর পাশাপাশি হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আয়িশা (রা.)-এর মৃত্যু হলে তাঁকে বাকি আল গারকাদে সমাহিত করা হয়।

---

৯৯ قال عمر بن الخطاب حين حضرته الوفاة: اني كنت استأذنت عائشة اذا مت ان ادفن في

উষ্ট্রের যুদ্ধ

উসমান (রা.)-এর শাসনকাল। তখন চারদিকে ফিতনার ছড়াছড়ি। এই সময় উসমান (রা.)-এর একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.)। তিনি উসমান (রা.)-এর একজন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন, তাঁর প্রশংসা করতেন। উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হওয়ার সময় আয়িশা (রা.) হজ পালন করছিলেন। ফলে তিনি সেখানে আসতে পারেননি। পরে উসমান (রা.)-এর হত্যার খবর শুনে তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং মদিনায় ফিরে না গিয়ে ইরাকে চলে যান। হত্যাকারীদের শিরশ্ছেদের ঘোষণা তিনিই প্রথম দেন। এ ঘটনার সূত্র ধরে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এ যুদ্ধে আয়িশা (রা.) উষ্ট্রের পিঠে চড়ে যুদ্ধাভিযানের নেতৃত্ব দেন। বর্ণনানুযায়ী—এ যুদ্ধে তিনি আহত হয়েছিলেন, তবে সেটা কারও আঘাতে নয়। তাঁকে আঘাত করার মতো দুঃসাহস কারও নেই। তাঁর উট আহত হয়ে শুয়ে পড়েছিল। এক্ষেত্রে সম্ভবত দুর্ঘটনাবশত কিছু তির তাঁর দিকে এসেছিল। সেই তিরের আঘাতে আয়িশা (রা.)-এর হাত রক্তাক্ত হয়ে যায়।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সবাই আয়িশা (রা.)-এর খোঁজ করছিলেন। কারণ, এ যুদ্ধে তিনি পরাজিত এবং অনেক মানুষ নিহত হয়েছিল। আলি (রা.) মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রা.)-কে পাঠালেন আয়িশা (রা.)-কে খোঁজার জন্য। তিনি তাঁকে সুস্থ অবস্থায় দেখতে পেলেন। নবিজির পূর্বের নির্দেশ অনুযায়ী আলি (রা.) তাঁর সাথে সম্মানজনক আচরণ করলেন এবং সম্মানজনকভাবে তাঁকে বসরায় পাঠিয়ে দিলেন। এ সময় ৪০ জন নারীকে তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে রাখা হয়। আলি (রা.) তাঁর দুই সন্তান হাসান ও হুসাইন (রা.)-কেও তাঁর দেখভাল করার জন্য সাথে প্রেরণ করেন।

এর দ্বারা প্রমাণ হয়, অনাকাঙ্ক্ষিত এ যুদ্ধের পর তাঁদের মধ্যকার আচরণ অসুন্দর ও অনৈসলামিক ছিল না।

সহিহ বর্ণনানুযায়ী—

> 'আয়িশা (রা.) এ ঘটনার জন্য সারাজীবন পরিতাপ করতেন। কুরআন তিলাওয়াতের সময় তিনি কান্নায় ভেঙে পড়তেন। বলতেন—"হায়! আমি যদি বৃক্ষ বা পাথর হয়ে জন্মগ্রহণ করতাম, তাহলে এ ঘটনায় থাকতাম না!" তিনি যখন "ওয়াকারনা ফি বুয়ুতিকুন্না" আয়াতাংশ পড়তেন, তখন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতেন—"হায়! আমি যদি ঘরে অবস্থান করতাম!"'[১০০]

আয়িশা (রা.) কখনোই যুদ্ধ ও হত্যাযজ্ঞ চাননি। তিনি কেবল প্রতিবাদ করেছিলেন; কিন্তু কখনো কখনো প্রতিবাদও সহিংস হয়ে ওঠে। আর সে যুগে সবার কাছেই অস্ত্র থাকত। ফলে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য না থাকলেও এটা ঘটে যেত। আয়িশা (রা.) কখনোই চাননি এ রক্তপাত বা যুদ্ধ হোক, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। আয়িশা (রা.) মনে করতেন, এতে তাঁর অংশগ্রহণ করা উচিত হয়নি।

তখন আলি (রা.) ও আয়িশা (রা.) দুজনই নিজেদের সর্বোত্তম ভূমিকা রাখতে পারেননি। কেউ কেউ বলতে চেষ্টা করেন, সেখানে তেমন কিছু হয়নি। এটি অতিরঞ্জিত কথা। আর অতিরঞ্জন কখনো ভালো কিছু বয়ে আনে না। প্রকৃত ব্যাপার হলো, সেখানে দুটি বাহিনী একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, রক্তপাত হয়েছে।

তবে আমরা এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় সতর্ক থাকব, যেন আমাদের কোনো বক্তব্য অতিরঞ্জিত না হয়ে যায়। এ ঘটনার ব্যাপারে আলি (রা.) উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.) সম্পর্কে কোনো বাজে মন্তব্য করেননি। আর আয়িশা (রা.)-ও কখনো আলি (রা.) সম্পর্কে বাজে কিছু বলেননি। তাঁরা একে অপরের প্রতি ইসলামি ও সম্মানজনক আচরণ করেছেন এবং ইসলামের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে চেষ্টা করেছেন।

আলি (রা.)-এর মৃত্যুর পর আমিরে মুয়াবিয়া (রা.) ক্ষমতায় আসেন। তাঁর ক্ষমতায় আরোহণের সময় আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমরা সেসবের

---

[১০০] বুখারি : ৪৪৭৬; মুসনাদে আহমাদ : ১/২২০

বিবরণে যাব না। কেননা, এ বইটির আলোচ্য বিষয় সেগুলো নয়। শুধু মাথায় রাখবেন, আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট। কারণ, তিনি ছিলেন নবিজির একজন সাহাবি। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করব, কিন্তু অন্যান্য জ্যেষ্ঠ সাহাবির সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে যাব না। তিনি নবিজিকে দেখেছেন কিশোর বয়সে। ছিলেন কনিষ্ঠ সাহাবি। জ্যেষ্ঠ সাহাবিদের সাথে তাঁর কোনো তুলনা হয় না। আমরা কেবল তাঁদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করব। কারণ, আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন—'রাদিয়াল্লাহু আনহু অর্থাৎ আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট।'

মুয়াবিয়া (রা.) সব সময়ই আয়িশা (রা.)-এর সমর্থন লাভের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। আয়িশা (রা.)-এর কাছে অনেক উপহার পাঠিয়েছেন। একবার তাঁর কাছে এক লাখ দিরহাম উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু আয়িশা (রা.) একটি দিরহামও স্পর্শ করেননি; বরং এক ঘণ্টার মধ্যে তা অন্যদের দান করে দিয়েছিলেন। মুয়াবিয়া (রা.) তাঁকে অনেক উপহার দিতেন। এমনকি তিনি আয়িশা (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে একবার মদিনায়ও এসেছিলেন। আয়িশা (রা.) তাঁকে বাড়ির ভেতরে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন (অবশ্যই পর্দা রক্ষা করে)। তবে তাঁদের আলাপচারিতা ঝামেলাবিহীন ছিল না বলেই অনুমান করা হয়। কেননা, মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা আয়িশা (রা.) পছন্দ করেননি। যার অন্যতম হলো—মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রা.) আলি (রা.) দ্বারা মিশরের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। মুয়াবিয়া (রা.) ক্ষমতায় আসার পর মিশরের গভর্নর মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রা.) তাঁর আনুগত্য অস্বীকার করেন এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। এজন্য মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠান। সেখানে তাঁকে পরাজিত ও বন্দি করা হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডও প্রদান করা হয়। এজন্য মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রতি আয়িশা (রা.) অসন্তুষ্ট ছিলেন। শুধু এ ঘটনাই নয়; তখন এমন আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল।

ফলে সাক্ষাতের সময় আয়িশা (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) পরস্পরের মর্যাদা সমুন্নত রাখলেও আয়িশা (রা.) তাঁর প্রতি খুশি ছিলেন না।

তিরমিজি শরিফের একটি বিখ্যাত হাদিসে এসেছে—

> 'মুয়াবিয়া (রা.) সংক্ষিপ্ত উপদেশ চেয়ে আয়িশা (রা.)-এর নিকট পত্র পাঠালেন। আয়িশা (রা.) তাঁকে লিখলেন—
> "আমি নবিজিকে বলতে শুনেছি—যারা আল্লাহকে খুশি রাখতে গিয়ে জনগণকে অখুশি রাখে, আল্লাহ জনগণ থেকে (জনগণের

> ক্ষতি থেকে) তাকে হেফাজত করেন। আর যে জনগণকে খুশি রাখতে গিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তাকে জনগণের নিকট ছেড়ে দেন (জনগণের দ্বারা তার ক্ষতি হয়)।”’[১০১]

এখানে একটি রাজনৈতিক বার্তা রয়েছে। এটা মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওপর বড়ো ধরনের প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল। আয়িশা (রা.) মুয়াবিয়া (রা.)-কে নসিহত প্রদান করেছেন, যা তিনি চিঠি মারফত চেয়েছিলেন।

মুয়াবিয়া (রা.)-এর সময়কার একটি বিখ্যাত ঘটনা সহিহ বুখারিতে এসেছে। মদিনায় মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিয়োগকৃত গভর্নর ছিলেন মারওয়ান ইবনুল হাকাম। এ সময় মুয়াবিয়া (রা.) মারওয়ানের কাছে বার্তা পাঠালেন—

> ‘আমি ইয়াজিদকে আমার পরবর্তী খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করেছি। আমার মৃত্যুর পরে ইয়াজিদ হবে খলিফা। সুতরাং আমার জীবিতাবস্থায়ই সকল গভর্নরকে ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে হবে।’

এটা ছিল এক নতুন ধারণার প্রবর্তন, যা ইসলামের ইতিহাসের মোড়কে চিরতরে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। খিলাফতে রাশেদা রূপান্তরিত হয়েছিল খিলাফতে মুলুকিয়াতে। এখানে মনে রাখতে হবে, এ খিলাফতে মুলুকিয়া হারাম কিছু নয়। কতিপয় ধারার আলিমগণ মনে করেন যে, এটা হারাম। না, এটা হারাম নয়। তবে এটা পুরোপুরি ইসলামের মূল আদর্শ অনুযায়ী কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থাও নয়। কিন্তু এটাকে হারাম বলার সময় মাথায় রাখতে হবে—যদি খিলাফতে মুলুকিয়া হারাম হয়, তবে ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এ বিশাল অধ্যায়কে হারাম সাব্যস্ত করা হবে।

এ পত্র পাওয়ার পর মারওয়ান মদিনায় খুতবা প্রদানের সময় বললেন—

> ‘আমিরুল মুমিনিন নির্দেশ জারি করেছেন, আমাদের সকলকে তাঁর পুত্র ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে হবে।’

পাশেই ছিল আয়িশা (রা.)-এর ঘর। তিনি ঘর থেকে এ বক্তব্য শুনছিলেন। আর এদিকে মারওয়ানের এ বক্তব্য শুনে সাহাবিরা তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দিলেন। তাঁরা মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই সিদ্ধান্ত পছন্দ করলেন না। আর এ সিদ্ধান্ত পছন্দ না করাটিই তাঁদের ঈমানের পরিচায়ক। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন—

'আপনি মূলত কী বলতে চান? আপনি কি রাজবংশীয় শাসন চালু করতে চান?'

'(মারওয়ান যুক্তি দেখিয়ে বললেন) এটা আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর সুন্নাহ।'

তখন আয়িশা (রা.)-এর বড়ো ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন—

'না! এটা হচ্ছে হিরাক্লিয়াস ও কিসরার সুন্নাহ।'

মারওয়ান এতে অপমানিত বোধ করলেন। কারণ, মারওয়ান ছিলেন গভর্নর। অন্যদিকে মারওয়ানের ভাবনা ছিল, এর মাধ্যমে আমিরুল মুমিনিন মুয়াবিয়া (রা.)-কে জনসম্মুখে আপমান করা হয়েছে। ফলে তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.)-কে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলেন। সৈন্যরা তাঁকে গ্রেফতারের জন্য উদ্ধত হলে আবদুর রহমান (রা.) তাঁর বোন আয়িশা (রা.)-এর ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেন।

ভদ্রতা ও ঈমান বিদ্যমান থাকায় সৈন্যরা জোরপূর্বক উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকলেন। এ পর্যায়ে মারওয়ান ঘরের বাইরে থেকে চিৎকার করে আবদুর রহমান (রা.)-কে তাঁর হাতে তুলে দিতে বললেন। তবে তিনি নিজেও জোরপূর্বক আয়িশা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করেননি। আয়িশা (রা.) জানিয়ে দিলেন—'না, আমি তাঁকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো না।'

তখন মারওয়ান যেহেতু আবদুর রহমান (রা.)-এর মন্তব্য দ্বারা অপমানিত হয়েছিলেন, তাই তিনি নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য একটি আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন—

'এই আয়াত আবদুর রহমানের ব্যাপারে আল্লাহ পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন।' (অথচ এটা খুব খারাপ লোকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছিল। আর মারওয়ান নিজের মুখরক্ষা করতে যুক্তি দিচ্ছেন, এটা আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।)

আয়িশা (রা.) জবাবে বললেন—'তুমি মিথ্যা বলছ! আমি জানি এ আয়াত কার সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আর তা আমি প্রকাশ করতে চাই না। এ আয়াত আমার ভাই আবদুর রহমান সম্পর্কে নাজিল হয়নি। আর তোমার

ব্যাপারে যদি বলি, তোমার বাবাকে নবিজি অভিশাপ দিয়েছিলেন, তুমিও সে অভিশাপের অংশীদার!'

এ ঘটনায় আয়িশা (রা.)-এর ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। যেখানে তিনি তাঁর প্রতিবাদী ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.)-কে রক্ষা করেছিলেন।

আয়িশা (রা.) মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে ইন্তেকাল করেন। খুব সম্ভবত ৫৮ হিজরির ১৭ রমজান সন্ধ্যায় তিনি ইন্তেকাল করেন। যেহেতু তিনি আমাদের উম্মুল মুমিনিন ছিলেন, এজন্য তাঁর অধিকতর পর্দা নিশ্চিত করার জন্য তাঁকে রাতেই দাফন করা হয়। তারাবি ও বিতর নামাজ সমাপ্ত হওয়ার পর জ্যেষ্ঠ সাহাবি আবু হুরায়রা (রা.)-এর ইমামতিতে তাঁর জানাজা সম্পাদিত হয়। পরবর্তী জানাজাগুলোর ইমামতি করেন তাঁর প্রপৌত্র আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.), উরওয়া ইবনে জুবাইর (রা.), আবু বকর (রা.)-এর নাতিগণসহ অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। তাঁরাই আয়িশা (রা.)-কে বাকি আল গারকাদ গোরস্থানে দাফন করেন।[১০২]

বিয়ের বয়স
দুষ্টের সমালোচনা এবং হিস্টোরিক্যাল রিভিশন

এ বিষয়টি নিয়ে পূর্বে খানিকটা আলোচনা করা হয়েছে, তবে এখানে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বিয়ের সময় আয়িশা (রা.)-এর বয়স কত ছিল—এ নিয়ে তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। আর এ সমস্ত হাদিসের সনদ সহিহ, যা বিভিন্ন সনদে বুখারি-মুসলিমসহ অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তখন তাঁর বয়স কত ছিল, তা খুবই সুস্পষ্ট; এটা নিয়ে মতভেদ থাকাটাই বেমানান।

আয়িশা (রা.)-এর নিজ ভাতিজা হিশাম ইবনে উরওয়া (রা.) তাঁর পিতা উরওয়া (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন; আর তাঁর পিতা বর্ণনা করেছেন স্বয়ং আয়িশা (রা.) থেকে। এ ছাড়া অন্যরাও আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন; আয়িশা (রা) বলেন—

> 'নবিজি যখন আমাকে বিয়ে করেন, তখন আমি ছিলাম ছয় বছর বয়সি। আর নয় বছর বয়স হওয়ার পর তিনি আমার সাথে রাতযাপন শুরু করেন। আর যখন তিনি ইন্তেকাল করেন, তখন আমার বয়স ছিল ১৮ বছর।'[১০৩]

এ হাদিসটি বহুসংখ্যক তাবেয়ি বর্ণনা করেছেন, যারা আয়িশা (রা.)-এর নিকট থেকে এ বক্তব্য সরাসরি শুনেছেন। সুতরাং বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট। এ ছাড়া অন্য সাহাবিগণও এটিই বর্ণনা করেছেন।

---

[১০৩] বুখারি : ৩৮৯৪; মুসলিম : ১৪২২

তিরমিজি শরিফে উল্লিখিত হাদিসে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন—

> 'নবিজির সাথে বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। তাঁরা একান্তে রাত্রিযাপন শুরু করেন নয় বছর বয়সে। আর আয়িশা (রা.)-এর ১৮ বছর বয়সে নবিজি ইন্তেকাল করেন।'[১০৪]

এ হাদিসেও আমরা ঠিক একই রকম বক্তব্য দেখতে পাচ্ছি। জাবির (রা.) বর্ণনা করেন—

> 'নবিজির সাথে বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল সাত বছর। তাঁরা একান্তে রাত্রিযাপন শুরু করেন তাঁর নয় বছর বয়সে। আর নবিজি তাঁর (আয়িশা রা.-এর) ১৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।'

এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, একই বর্ণনা এসেছে। ছয় আর সাত খুব বেশি পার্থক্যের ব্যাপার নয়।

অর্থাৎ এসব বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারছি, বিয়ের সময় আয়িশা (রা.)-এর বয়স ছিল ছয়-সাত বছর। আর নয় বছর বয়সের সময় নবিজির সাথে তাঁর একান্তে রাত কাটানো শুরু হয় এবং তাঁর ১৮ বছর বয়সে নবিজি ইন্তেকাল করেন। এ ছাড়া সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে আয়িশা (রা.)-এর বয়স নিয়ে অনিশ্চিত কোনো বক্তব্যের অস্তিত্ব নেই।

আরেকটি বিষয় হলো—তাঁর বয়সের ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। যদিও ঐতিহাসিক বয়সসংক্রান্ত ব্যাপারে ইজমা হয় না, তারপরও বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন গ্রন্থকার আয়িশা (রা.)-এর বয়সের ব্যাপারে ইজমা প্রদান করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইবনে আবদুল বার (রহ.)। তিনি বলেন—

> 'আয়িশা (রা.)-এর বয়স নিয়ে কোনো মতপার্থক্যের কথা আমার জানা নেই।'

ইবনে কাসির (রহ.) বলেন—

> 'এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, নবিজির সাথে বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল সাত বছর। তাঁরা একান্তে রাত্রিযাপন শুরু করেন তাঁর নয় বছর বয়সে।'

---

[১০৪] মুসলিম : ১৪২২

ইবনে হাজেমসহ অনেক উলামা আয়িশা (রা.)-এর বয়স সম্পর্কে একই মত পোষণ করেন।

এখানে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে, ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে ইজমা ও ধর্মতত্ত্বের ইজমা এক নয়। আর ইতিহাস ও আকিদা এক জিনিস নয়। সুতরাং কেউ যদি এ ইজমার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে এবং বিয়ের সময় আয়িশা (রা.)-এর বয়স ১৮ বছর ছিল বলে দাবি করে, তবে আমরা বলব না এটা বিদআত, ভুল চিন্তা কিংবা সুন্নি আকিদার বিপরীত। কেননা, ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্ব এক বিষয় নয়। যদিও কেউ কেউ মনে করেন, ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্ব একই বিষয়।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো—কেউ যদি নিজেদের মতামতকে কোনোভাবে প্রমাণ করতে চায়, এতে আমাদের তেমন কোনো সমস্যা নেই।

তবে আয়িশা (রা.)-এর বয়স নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। আয়িশা (রা.)-এর বয়স নিয়ে হিস্টোরিক্যাল রিভিশন করার একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। আজকাল অধিকাংশ দেশে এত কম বয়সে বিয়ে গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে বিয়ের সময় আয়িশা (রা.)-এর বয়সসংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্য পরিবর্তন করতে চাওয়ার পেছনে বর্তমান তথাকথিত সুশীল সমাজ এবং রাষ্ট্রের আপত্তি উত্থাপনের বিষয়টি জড়িত। এ আপত্তির কারণে আয়িশা (রা.)-এর বয়স পরিবর্তন করতে হিস্টোরিক্যাল রিভিশন করা হয়। কিন্তু এতে একটি বিপজ্জনক দরজা খুলে যায়। আর তা হলো—পরবর্তী সময়ে তথাকথিত সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে অগ্রহণযোগ্য বিভিন্ন ইসলামিক ইস্যু নিয়ে হিস্টোরিক্যাল রিভিশন করার প্রবণতা শুরু হবে—যা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে চাই, আয়িশা (রা.)-এর বয়স পরিবর্তন করার এ পদ্ধতি পরাজিত মনস্তত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। এতকাল আয়িশা (রা.)-এর বয়স নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরি হয়নি। বর্তমানে আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিতে এটা সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ছয় বছর বয়সের মেয়েকে বিয়ে! যদিও নবিজি একান্তে রাত্রিযাপন শুরু করেন নয় বছর বয়সে। আমাদের যুগে ব্যাপারটি অস্বাভাবিক মনে হয়। আর বর্তমানে অধিকাংশ দেশেই এ রকম বয়সের মেয়েকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। তা ছাড়া এ বিয়ের সময় নবিজি ছিলেন পঞ্চাশ বছরের কোঠায়। এটা হচ্ছে এমন একটি বিষয়, যা আমাদের সময় কঠিন মনে হচ্ছে। আমাদের সময়ে অনেক দেশে এ বয়সে বিবাহ করা অবৈধ।

যারা ইসলামকে ঘৃণা করে, তারা এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে নবিজি সম্পর্কে অসৌজন্যমূলক ভাষা ব্যবহার করে। এ ভাষাগুলো এখানে উল্লেখ না করাই শ্রেয়। প্রত্যেক মুসলিমই চায় এর জবাব দিতে। কিন্তু কীভাবে? একদল উলামা এ বিষয়টির মোকাবিলা করতে আয়িশা (রা.)-এর বয়স নতুন করে ঠিক করে দিচ্ছে (হিস্টোরিক্যাল রিভিশনিজম-এর মাধ্যমে)! বলা হচ্ছে, বিয়ের সময় আয়িশা (রা.)-এর বয়স ছিল ১৮ বছর। সুতরাং ইসলামবিরোধীদের অভিযোগ থেকে আমরা মুক্ত!

উল্লেখ্য, অনেক সময় হিস্টোরিক্যাল রিভিশন সঠিক হয়, অনেক সময় আবার ভুলও হয়। কখনো এটা আগ্রহোদ্দীপক, আবার কখনো এটা হয়ে যায় বিপজ্জনক। তবে বর্তমানে লোকজন এটা করতে খুবই উৎসাহী।

তবে আমাদের হিস্টোরিক্যাল রিভিশনিজম করার সময় অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। যখন আমরা কোনো বিষয়কে সমস্যাযুক্ত দেখব, তখন যেন হুট করেই এ পথে পা না বাড়াই। আমাদের তখন দেখতে হবে—হাদিস ও ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিলগুলো কী প্রকাশ করছে।

যারা আয়িশা (রা.) ও নবিজির বিয়েসংক্রান্ত ঐতিহাসিক বয়ানের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন, তাদের অনেকেই হাদিস ও ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিলের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং হিস্টোরিক্যাল রিভিশনিজমকে সমস্যাপূর্ণ বলে মতামত দিয়েছেন। তাদের একজন হলেন ড. কিইশা আলি, যিনি প্রোগেসিভ ইসলাম ও ইসলামিক ফেমিনিজম সম্পর্কে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তিনি তার লেখা *Sexual Ethics in Islam* বইয়ে বলার চেষ্টা করেছেন, নবিজির ব্যক্তিগত জীবন এবং তাঁর সাথে আয়িশা (রা.)-এর বিয়ে নিয়ে দুই ধারার বক্তব্য বিদ্যমান। এ দুটি ধারাকেই তিনি বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করেছেন—

১. মুসলমানরা মনে করে—নবিজি যা করেছেন, তা সঠিক এবং সকল যুগেই তা করা যাবে।
২. আর অন্যরা এ বিষয়টিকে আমাদের যুগের রীতিনীতির চশমা পরে অতীতকে বিচার করেন।

তার বিপজ্জনক শব্দের আওতায় এক নম্বরটিও পড়েছে (কিন্তু এটাই মুসলমানদের ঈমানের অংশ—অনুবাদক)। ফলে সংশ্লিষ্ট বক্তব্যের সঙ্গে আমি খুব সচেতনভাবে দ্বিমত পোষণ করি।

অতীতের কোনো ঘটনা সম্পর্কে মতামত দিতে হলে আমাদের সেই প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে হবে; মাথায় রাখতে হবে আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপট ও রীতিনীতি।

এটি জানা বিষয়, অতীতে বাল্যকালে বিয়ে হওয়া কেবল আরবে নয়; সারা পৃথিবীজুড়ে ছিল প্রথাসিদ্ধ। পুরো মানবজাতির ইতিহাসে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাল্যকালে বিয়ে হওয়ার প্রচলন ছিল, বিশেষ করে বিখ্যাত ব্যক্তিদের বিয়ের ক্ষেত্রে। রাজাদের কন্যা বা মহান ব্যক্তিদের কন্যাদের খুবই অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হতো। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ সম্মতিও নেওয়া হতো না।

রাজনৈতিক কারণেও অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হতো। দুটি পরিবার, দেশ বা অঞ্চলের মধ্যকার কোনো চুক্তির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে, চুক্তিকে মজবুত করতে এ রকম বিয়ে অনুষ্ঠিত হতো। দুটি বিবদমান রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যেও অল্প বয়সে বিয়ে হতো। উদাহরণস্বরূপ আমরা স্পেনের বিবদমান দুটি অঞ্চলের মিলের জন্য ফার্ডিনান্দ ও ইসাবেলার কথা আনতে পারি। এটি ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কেননা, এ বিয়ের মাধ্যমে বিবদমান দুটি খ্রিষ্টান রাষ্ট্র এক হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে এবং স্পেন থেকে মুসলিমদের বিতাড়নে সমর্থ হয়। এটি রাজনৈতিক বিয়ের একটি স্পষ্ট উদাহরণ। এক্ষেত্রে ভালোবাসা বা অন্য কোনো ব্যাপার ছিল না; এটা ছিল দুটি রাষ্ট্রের ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হওয়ার ব্যাপার। সে সময় এ ধরনের রাজনৈতিক বিয়ের প্রচলন ছিল।

তা ছাড়া সে সময়ে প্রত্যাশিত গড় আয়ু কম ছিল। বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হতো অল্পবয়সেই। সংস্কৃতি ও প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি ছিল বর্তমান যুগ থেকে ভিন্ন। এজন্যই এতদিন কট্টর ইসলামবিরোধী শক্তিও নবিজির জীবনের এ ঘটনাকে সমস্যা হিসেবে চিত্রায়িত করেনি। এটা নতুন উত্থাপিত ইস্যু। মাত্র ৩০-৪০ বছর আগ থেকে এ বিষয়টিকে সমস্যা হিসেবে চিত্রায়িত করা শুরু হয়েছে।

আর ২০০ বছর আগেও যখন পশ্চিমা লেখকরা নবিজি সম্পর্কে লিখেছেন, তারা এ বিষয়টিকে সমস্যা হিসেবে চিত্রায়ণ করেননি। কেননা, ২০০ বছর আগেও এ রকম অল্প বয়সে বিয়ে সংঘটিত হতো।

সুতরাং যারা নবিজি ও আয়িশা (রা.)-এর বিয়ের বয়স নিয়ে বাজে মন্তব্য করে নবিজির চরিত্রের ওপর কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টা করে, তারা মূলত 'অ্যাকাডেমিক্যালি' শিক্ষিত নয়। তারা হয়তো হাইস্কুল বা কলেজে পড়েছে

(অন্য কোথাও পড়ালেখা করলেও তাদের জ্ঞান আহরণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি এই পর্যায়ের)। কিন্তু তারা ইতিহাস ভালো করে পড়েনি। কেননা, ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা থাকলে এ বিষয়টি জানা থাকবে যে, বিয়ের বয়স ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে।

আমি এখানে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। উল্লেখ করতে চাই কিছু বাস্তব ইতিহাস, যেন এর মাধ্যমে কিছু অজ্ঞ সমালোচনাকারী জবাব পেয়ে যায়।

পশ্চিমা বিশ্বে প্রথমবারের মতো বিয়ের বয়স নিয়ে আইনগত সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা শুরু হয় সিজার অগাস্টাস-এর শাসনামলে। তখন ঠিক করা হয়, বিয়ের সময় মেয়েদের বয়স ১০ বছর হতে হবে। তিনি এ আইন করেছিলেন বটে, কিন্তু এজন্য জনগণকে বাধ্য করেননি। আর আয়িশা (রা.) নবিজির সাথে একান্তে রাত্রিযাপন শুরু করেন নয় বছর বয়সে। সুতরাং এখানে সমস্যার কী কারণ থাকতে পারে? যারা ১০ বছর আর নয় বছর বয়সের গুণগত পার্থক্য নিয়ে হাজির হবেন, তাদের জেনে রাখা উচিত—ইউরোপীয় ও আরবদের মহাদেশ ও সংস্কৃতি আলাদা ছিল।

তা ছাড়া মধ্যযুগীয় ইউরোপে গ্রেশন দ্যা ক্লেরিক ছিলেন ক্যানন ল (ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের শরিয়ত)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ক্যানন ল-এর রূপদান করা হয় ১২ শতাব্দীতে। তিনি ক্যানন ল-তে লিখেন, বয়ঃসন্ধির সময় হলো ১২-১৪ বছর। আর এটাই বিয়ের জন্য ন্যূনতম আইনসংগত বয়স হওয়া উচিত। তবে তিনি স্বীকার করেন, এ বয়সসীমার আগেও বিয়ে হতে পারে। তিনি এখানে ৯০০ বছর আগের প্রচলন ও সংস্কৃতি অনুযায়ী বলেছেন—১২-১৪ হতে পারে বিয়ের আইনসংগত বয়স।

শেক্সপিয়র *রোমিও ও জুলিয়েট* লিখেছেন ৫০০ বছর আগে। এ নাটকের মঞ্চায়নের সময় জুলিয়েট চরিত্রে যে নায়িকা অভিনয় করেছে, তার বয়স ছিল ১৩-১৪ বছর। এর কারণ কী? কারণ হলো—'বায়োলজিক্যালি' ও বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে ৫০০ বছর আগে ১৩-১৪ বছরের মেয়েকে বর্তমান যুগের ১৭ বছর বয়সি মেয়ের সমান জ্ঞান করা হতো। আমাদের সময়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভালোবাসার আবেগ দেখা যায় ১৪-১৫ বছর বয়সে। আর ৫০০ বছর আগে জুলিয়েট ছিল ১৩ বছর বয়সের। এর মাধ্যমে আমরা কী বুঝতে পারি? বুঝতে পারি—এ বিষয়টি সময় ও কালের পরিক্রমায় পরিবর্তন হয়।

ফ্রান্সের আইন প্রণয়নের ইতিহাসে 'নেপোলিয়নিক কোড' নামের একটি আইন রয়েছে। এটি মাত্র ২০০ বছর আগের আইন। এতে মেয়েদের বিয়ের আইনসংগত বয়স উল্লেখ করা হয়েছে ১৩ বছর।

এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে, এ বয়সসীমা ছিল আইনসংগত বয়সসীমা। ফলে সে যুগের মেয়েদের বয়ঃসন্ধি ও বিয়ের বয়স আরও আগেই হয়ে যেত বলে আমরা বুঝতে পারি।

১৫, ১৬, ১৭ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে এমন অল্পবয়সে বিয়ে সংঘটিত হওয়ার শত শত 'কোর্ট রেকর্ড' আছে। এমনকি 'প্রি-কলোনিয়াল' আমেরিকায়ও ১৬, ১৭ শতাব্দীতে ১০, ১১, ১২ বছর বয়সে বিয়ে হওয়ার 'কোর্ট রেকর্ড' পাওয়া যায়। ম্যাসাচুসেটসের একটি বিখ্যাত কেইসে আমরা দেখতে পাই—১০ বছরের স্ত্রী তার স্বামীর নিকট তালাক চাইছে! তাহলে তার বিয়ে কখন হয়েছে? আপনারাই চিন্তা করুন। অবশ্যই তালাক চাওয়ার অন্তত কিছুদিন আগে বিয়ে হয়েছে! এটা ছিল ৩০০ বছর আগে 'প্রি-কলোনিয়াল' আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসের ঘটনা।

সুতরাং আমাদের কাছে যখন নবিজি ও আয়িশা (রা.)-এর বিয়ের বয়স অগ্রহণযোগ্য মনে হবে, তখন মাথায় আনতে হবে—বিষয়টি সে যুগের মানুষের জন্য মোটেই অগ্রহণযোগ্য কিছু ছিল না। যখন আমরা বলি—'হায় আল্লাহ! নবিজি মাত্র নয় বছরের মেয়ের সঙ্গে একান্তে সময় কাটিয়েছেন!' মূলত এটি আমাদের অজ্ঞতাকেই প্রকাশ করে। কেননা, নয় বছর বয়সে এমনটি হওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। সে যুগের জন্য এটাই ঠিক ছিল। আমরা যদি নিজেদের দাদি-নানিদের বিয়ের বয়সেরও খোঁজ নিই, তবে অনেকেই দেখতে পাব—তাদের বিয়েও ১৩-১৪ বছর বয়সে হয়েছে। সে সময় এমন বয়সে বিয়ে হওয়ার প্রচলন ছিল।

ঐতিহাসিকভাবে বিষয়টি প্রমাণিত যে, সময় ও সংস্কৃতির পরিবর্তন অনুযায়ী বয়ঃসন্ধিকাল দেরিতে শুরু হচ্ছে। বুদ্ধিমত্তার বিকাশও দেরিতে হচ্ছে—আমরা সকলেই তা জানি। আর নয় বছর বয়সে আয়িশা (রা.) যদি শারীরিকভাবে ও বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে পরিপূর্ণ হয়ে থাকেন, তাহলে নবিজি তাঁর সাথে একান্ত সময় কাটিয়ে কোনো অন্যায় করেননি। সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁর নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো সুযোগ নেই।

আয়িশা (রা.)-এর বয়সসংক্রান্ত আলোচনায় হিস্টোরিক্যাল রিভিশনিজমের বিরোধিতা করেছি বলে ভাববেন না, আমি হিস্টোরিক্যাল রিভিশনিজমের বিরুদ্ধে। যদি কোনো প্রকৃত সত্য বের করে আনা যায়, তবে এটা করলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আয়িশা (রা.)-এর বয়সসংক্রান্ত ব্যাপারে এ বিষয়টির প্রয়োগ আমি সম্মানের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করি। কেননা, সংস্কৃতি ও যৌনতা নিয়ে আমাদের জ্ঞানের কমতি থাকার কারণেই আমরা হিস্টোরিক্যাল রিভিশনিজমের অপপ্রয়োগ করতে চাচ্ছি। আর নবিজির প্রসঙ্গে উত্থাপিত অবমাননাকর অভিযোগের জবাব দিতে ভুল পদ্ধতি অনুসরণ করছি।

আর আপনার যদি সহিহ হাদিসের বর্ণনা (বিয়ের সময় আয়িশা রা.-এর বয়স ছিল ছয় বছর, একান্ত সময় কাটানো শুরু হয় নয় বছরে) নিয়ে সন্দেহ থাকে, তাহলে সরাসরি বললেই তো হয়, ২০১৯-২০ খ্রিষ্টাব্দে এত অল্প বয়সে বিয়ে করা আপত্তিকর! এটাই ভালো যুক্তি বহন করে।

যারা বলেন বিয়ের সময় আয়িশা (রা.)-এর বয়স ছিল ১৮ বছর, তাদের দলিলগুলো কী?

এ সম্পর্কে সম্ভবত সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রবন্ধ রচনা করেছেন আধুনিক যুগের সিরিয়ান স্কলার সালাহুদ্দিন আল ইদলিবি। এ প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটি ইংরেজিতেও অনুবাদ হয়েছে এবং অনলাইনে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিয়ের সময় আয়িশা (রা.)-এর বয়স বেশি ছিল—এটা প্রমাণ করতে তিনি 'সোর্স ক্রিটিসিজম' করেছেন। ব্যবহার করেছেন কন্টেক্সচুয়াল হিস্টরিক্যাল মেথডস, যা রিসার্চের ক্ষেত্রে বৈধ। আমরা এখানে তার গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে সমালোচনা করব না। মেথডলজির জন্য আমরা তার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করব না; বরং আমরা তার অ্যাকাডেমিক ইজতিহাদকে সম্মানজনক অবস্থানে রেখে তার বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করব। অর্থাৎ এ পর্যায়ে আমরা তার কিছু মূল পয়েন্ট নিজেদের ক্রমানুসারে উল্লেখ করে সেগুলো ভুল প্রমাণ করব।

পয়েন্ট-১ : তার সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল হলো—আয়িশা (রা.) ও আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)-এর বয়সের তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে আয়িশা (রা.)-এর বিয়ের বয়স বেশি প্রমাণিত করা।

তার প্রবন্ধে নিচের তথ্যগুলো সাজিয়ে একটি হিসাব কষা হয়েছে—

সমীকরণ-১ : আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) আয়িশা (রা.) থেকে ১০ বছরের বড়ো ছিলেন।

সমীকরণ-২ : আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) ইন্তেকাল করেন ৭৩ হিজরিতে।

সমীকরণ-৩ : ইন্তেকালের সময় আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)-এর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর।

এ তিনটি সমীকরণ অনুযায়ী আমরা বুঝতে পারি, আসমা (রা.)-এর ইন্তেকালের সময় যদি আয়িশা (রা.) জীবিত থেকে থাকেন, তাহলে তাঁর বয়স ছিল ৯০ বছর। তাহলে ৯০ থেকে হিজরি ৭৩ বছর বিয়োগ করলে আমরা দেখতে পাই, হিজরতের সময় আয়িশা (রা.)-এর বিয়স ছিল ১৭ বছর।[১০৫]

পয়েন্ট-২ : সহিহ বুখারির হাদিসে এসেছে, আয়িশা (রা.) বলেন—

> 'যখন সূরা ক্বামার নাজিল হয়, তখন আমি মক্কায় ছিলাম। আর আমি তখন খেলাধুলা করা ছোট্ট বালিকা ছিলাম।'[১০৬]

এ হাদিস থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, মক্কায় এ সূরা নাজিল হওয়ার সময় আয়িশা (রা.) খেলাধুলা করা ছোট্ট বালিকা ছিলেন। আর খেলাধুলা করার মতো ছোট্ট বালিকা অবশ্যই দুই-তিন বছরের বাচ্চা নয়; অবশ্যই কমপক্ষে চার-পাঁচ-ছয় বছরের বেশি হবে।

পয়েন্ট-৩ : এখানে তিনি নিজের মতামতকে শক্তিশালী করতে আয়িশা (রা.)-এর বর্ণিত অনেক হাদিস উল্লেখ করেছেন, যেগুলোতে মক্কার বিভিন্ন ঘটনাবলি উল্লিখিত আছে। উদাহারণস্বরূপ আবু বকর (রা.)-এর আবিসিনিয়ায় হিজরতের প্রচেষ্টার কথা তিনি বর্ণনা করেছেন। সহিহ বুখারির হাদিস এটা, যেখানে উল্লেখ আছে—

> 'আবু বকর (রা.) আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে চাইলেন। তিনি তাঁর জিনিসপত্র গোছালেন। তখন ইবনে আদ-দাগেইন এটা জানতে পেরে হস্তক্ষেপ করেন। বলেন—"না, তোমার এখানে থাকতে হবে..."'[১০৭]

---

[১০৫] ৭৩ হিজরিতে যদি আয়িশা (রা.)-এর বয়স ৯০ বছর হয়, তবে আয়িশা (রা.)-এর জন্ম হিজরিপূর্ব ১৭ সালে হয়েছে। এ হিসাবের ওপর ভিত্তি করে শাইখ সালাহুদ্দিন আল ইদলিবি মত দিয়েছেন, বিয়ের সময় আয়িশা (রা.)-এর বয়স ছিল ১৮ বছর। কেননা, হিজরতের সময়কালে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।—অনুবাদক

[১০৬] বুখারি : ২১৭৫

[১০৭] বুখারি : ২১৭৫

আর এটা বর্ণনা করেছেন আয়িশা (রা.) নিজে। তিনি যদি তখন দুই বছরের থাকতেন, তাহলে তাঁর এ কথা মনে থাকার কথা না। সুতরাং এ ঘটনাবলি ঘটার সময় তিনি আরও বড়ো ছিলেন। সুতরাং এখান থেকে তার উল্লিখিত পয়েন্ট হলো, আয়িশা (রা.) মক্কার ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন।

পয়েন্ট-৪ : তাবারি তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আবু বকর (রা.) জাহেলি যুগে আসমা (রা.)-এর মা কুতাইলাকে বিয়ে করেন। আর উম্মে রুমানকেও তিনি জাহেলি যুগে বিয়ে করেন। এরপর শাইখ সালাহুদ্দিন আল ইদলিবি তাঁর প্রবন্ধে আবু বকর (রা.)-এর চারজন সন্তানের তালিকা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন, আবু বকর (রা.) আয়িশা (রা.)-এর মাকে জাহেলি যুগে বিয়ে করেছেন।

পয়েন্ট-৫ : সহিহ বুখারি ও মুসলিমের একটি হাদিস তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, যাতে বলা হয়েছে—আয়িশা (রা.) উহুদের যুদ্ধে আহতদের সেবা করেছেন। তিনি পানি বিতরণ করেছেন, ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন। এ থেকে যুক্তি হলো—নবিজি উহুদের যুদ্ধে ১৫ বছরের কম বয়সি কাউকে যাওয়ার অনুমতি দেননি। সুতরাং আয়িশা (রা.) যেহেতু উহুদ যুদ্ধে ছিলেন, অবশ্যই তাঁর বয়স ১৫ বছরের বেশি ছিল। আর উহুদ যুদ্ধ হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরিতে।

পয়েন্ট-৬ : একটি বর্ণনা অনুসারে ফাতিমা (রা.) ও আয়িশা (রা.)-এর বয়সের পার্থক্য ছিল পাঁচ বছর। একজন তাবেয়ি বলেন—'ফাতিমা (রা.) পাঁচ বছরের বড়ো ছিলেন আয়িশা (রা.) থেকে।'

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে—যখন ফাতিমা (রা.) জন্মগ্রহণ করেন, তখন পবিত্র কাবা ঘর পুনর্নির্মাণ হয়। আর তখন নবিজি ৩৫ বছর বয়সি ছিলেন।

এ দুটি বর্ণনা বিচার করে পাওয়া যায়, নবিজির ৩৫ বছর বয়সে ফাতিমা (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। আর আয়িশা (রা.) তাঁর পাঁচ বছর পর অর্থাৎ নবিজির ৪০ বছর বয়সে জন্মগ্রহণ করেন। যেহেতু ফাতিমা (রা.)-এর থেকে পাঁচ বছরের ছোটো হলেন আয়িশা (রা.), তাহলে হিজরতের সময় আয়িশা (রা.)-এর বয়স ছিল ১৩-১৪ বছর। সুতরাং নবিজি তাঁর সাথে একান্ত সময় কাটানো শুরু করেন, যখন আয়িশা (রা.)-এর বয়স ১৫ বছর কিংবা তার চেয়ে বেশি ছিল।

এখানে আমরা তাঁর উল্লেখিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি। এখন আমরা তাঁর উল্লিখিত এ ছয়টি পয়েন্টের ওপর আলোচনা করব এবং যুক্তি খণ্ডন করব—

এক নম্বর পয়েন্টে শাইখ সালাহুদ্দিন আল ইদলিবি উল্লেখ করেছেন, আসমা (রা.) ও আয়িশা (রা.)-এর বয়সের ব্যবধান ১০ বছর। এর জবাব হলো—এ তথ্যের বর্ণনাকারী হলেন একজন তাবেয়ি। তাঁর প্রদত্ত তথ্যকে আমরা ভুল বলব না। বলব—তিনি মূলত ১০ সংখ্যার আশপাশের সংখ্যার মাঝে বর্ণনা করতে চেয়েছেন। তা করতে গিয়ে তিনি একটু কম সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। বাস্তবে তাঁদের বয়সের ব্যবধান ছিল সম্ভবত ১৩-১৪ বছর। এখন কেউ বর্ণনা করতে গিয়ে এভাবে বলতেই পারেন—তাঁদের বয়সের পার্থক্য ছিল ১০ বছর। এক্ষেত্রে শাইখ সালাহুদ্দিন আল ইদলিবি একটি অস্পষ্ট তথ্যের বর্ণনা নিয়েছেন একজন তাবেয়ির কাছ থেকে। আর সেটি ব্যবহার করেছেন স্বয়ং আয়িশা (রা.)-এর দেওয়া তথ্যের বিপরীতে।

যেখানে আয়িশা (রা.) সুস্পষ্টভাবে বলছেন—'বিয়ের সময় আমি ছিলাম ছয় বছর বয়সি, আর আমরা একান্তে সময় পার করা শুরু করি নয় বছর বয়সে,' সেখানে তিনি একজন তাবেয়ির বর্ণনাকে তাঁর বিপরীতে উল্লেখ করে আয়িশা (রা.)-এর বয়স বেশি প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তা ছাড়া সে যুগে কারও বয়স রেকর্ড করে রাখা হতো না। ফলে এক্ষেত্রে একজন তাবেয়ির কাছ থেকে অস্পষ্ট বয়সের বর্ণনা আসা স্বাভাবিক। আবার তিনি একজন তাবেয়ি, সাহাবিও নন। তাঁর বর্ণনাকে আয়িশা (রা.)-এর বর্ণনার বিপরীতে দাঁড় করিয়ে স্বয়ং আয়িশা (রা.)-এর বয়সের হিসাব কষা বোধগম্য নয়।

দুই নম্বর পয়েন্টে তিনি আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদিস এনেছেন; যা বলছে, আয়িশা (রা.) বলেছেন—'সূরা ক্বামার মক্কায় নাজিল হওয়ার সময় আমি ছিলাম খেলাধুলা করা ছোট্ট বালিকা।' আয়িশা (রা.) তাঁর বয়সের উল্লেখ করতে আরবি শব্দ 'জারিয়াতান আলয়াবু' ব্যবহার করেছেন। এখানে জারিয়াহ শব্দ দ্বারা সুস্পষ্ট বয়সের সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় না। কেননা, আরবি 'জারিয়াহ' শব্দ দ্বারা বাচ্চার হাঁটা শুরু করা বয়স থেকে নিয়ে বয়ঃসন্ধির বয়সকে বোঝায়। অর্থাৎ হাঁটতে পারলেই একজন শিশুকে আরবিতে জারিয়াহ বলা হয়।

এক্ষেত্রে আরবে 'জারিয়াহ' হওয়ার জন্য নয় বছর বয়সি হওয়ার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ আয়িশা (রা)-এর বক্তব্য—'সূরা ক্বামার মক্কায় নাজিল হওয়ার

সময় আমি ছিলাম খেলাধুলা করা ছোট্ট বালিকা।' এর অর্থ হলো—তিনি তিন থেকে নয় বছর বয়সের মধ্যে যেকোনো বয়সের হতে পারেন। ফলে শাইখ সালাহুদ্দিন আল ইদলিবির প্রমাণ অকাট্য নয়।

বরং আমরা বলি—আয়িশা (রা.)-এর বিয়ে হয়েছিল ছয় বছর বয়সে। তিনি তখন 'জারিয়াহ'-ই ছিলেন। সুতরাং জারিয়াহ অবস্থায় সূরা ক্বামার নাজিল হওয়ার যুক্তি দিয়ে তাঁর বয়স বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই। কারণ, জারিয়াহ বলতে তিন বছরের বড়ো যেকোনো বয়সি বাচ্চাকেই বোঝায়। তাহলে আয়িশা (রা.)-এর ওই বক্তব্যের অর্থ আমরা বুঝতে পারি—যখন সূরা ক্বামার মক্কায় নাজিল হয়, তখন তিনি ছোট্ট শিশু ছিলেন।

'জারিয়াহ' শব্দটি নির্দিষ্ট কোনো বয়স সংখ্যা প্রকাশ করে না—এটাই মূলকথা। ফলে এ শব্দের অর্থ দিয়ে আয়িশা (রা.)-এর বিয়ে হওয়ার বয়স বাড়িয়ে বলার সুযোগ নেই।

তিন নম্বর পয়েন্টে তিনি উল্লেখ করেছেন, আয়িশা (রা.) জাহেলি যুগ ও মাক্কি যুগের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আর যুক্তি দেখিয়েছেন, সে সময় তাঁর ঘটনা মনে রাখার মতো বয়স ছিল। ফলে নবিজির সাথে তাঁর বিয়ের বয়সও প্রতিষ্ঠিত মতামতের থেকে বেশি ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এর জবাব হলো—এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। কেননা, আমরা সকলেই আমাদের জন্মের নিকট অতীতের ঘটনাবলি কিছু না কিছু জানি। কারণ, বেড়ে ওঠার সময় আমাদের পরিবার ও আত্মীয়দের নিকট থেকে সে সময়ের ঘটনা শুনেছি।

উদাহরণস্বরূপ, আমি '৭০-এর দশকে জন্মগ্রহণ করেছি। আমি '৭০-এর দশকের অনেক ঘটনাই আপনাদের জানাতে পারব। আমি সেগুলো দেখিনি, তারপরও বলতে পারব। কারণ, আমার জন্মের পরও সেগুলো নিয়ে বাবা-মা আলোচনা করেছেন। আমি রোটারি ফোন ব্যবহার করিনি বললে ভুল হবে না, কিন্তু সেটির কথা আমার মনে পড়ে। আবার 'এল পি প্লেয়ারস' আমি আমার জীবনে কখনো ব্যবহার করিনি, কিন্তু আমি এসব সম্পর্কে জানি। আবার আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম ক্যাসেট প্লেয়ার তেমন ব্যবহার করেনি, তারপরও তারা এ সম্পর্কে জানে। কেন জানে? কারণ, এগুলো তার জীবনের কাছাকাছি সময়ের। আমাদের আত্মীয়দের জীবনের কাহিনিও এ সবের মধ্যে আছে। আমরা এগুলো জানি। তাহলে আয়িশা (রা.) মাক্কি সময়ের ঘটনা বর্ণনায় তাঁর বয়স বেড়ে যাওয়ার কথা নয়। তিনি এগুলো

আশপাশের মানুষজন থেকে শুনেছেন; বাবা, মা, বোনদের থেকে। তা ছাড়া আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেছেন নবিজির প্রথম স্ত্রী খাদিজা (রা.) সম্পর্কে। তিনি তো খাদিজা (রা.)-এর সময়ে ছিলেন না! তাহলে কীভাবে জানলেন? নবিজি ﷺ মারফত তিনি এসব জেনেছেন।

সুতরাং আয়িশা (রা.) মাক্কি সময়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন—এ সূত্র ধরে বিয়ের সময় তাঁর বয়স বেশি ছিল এটা প্রমাণ করা যাচ্ছে না।

চার নম্বর পয়েন্টে ইসলাম আগমনের পূর্বে আবু বকর (রা.)-এর সাথে উম্মে রুমান ও কুতাইলার বিয়ের ব্যাপার বর্ণনা করা হয়েছে। আয়িশা (রা.)-এর মা উম্মে রুমানের বিয়ে ইসলাম আগমনের পূর্বে হওয়ায় এটা প্রমাণিত হয় না, আয়িশা (রা.) ইসলামপূর্ব যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন। এ বর্ণনার কোথাও বলা নেই, আয়িশা (রা.) ইসলাম আগমনের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন।

পাঁচ নম্বর পয়েন্টে বলা আছে, আয়িশা (রা.) উহুদের যুদ্ধে আহত সাহাবিদের সাহায্য করেছেন, সেবা করেছেন। আর উহুদ যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য নবিজি কমপক্ষে ১৫ বছর হতে হবে মর্মে বয়সসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এর জবাব হলো—মূলত এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে, যুদ্ধ করার জন্য ১৫ বছর হওয়া শর্ত ছিল। আয়িশা (রা.) আহতদের সেবা করেছেন, পানি খাইয়েছেন। সুতরাং যুদ্ধ করার জন্য নির্ধারিত বয়সসীমার সঙ্গে আয়িশা (রা.) কর্তৃক আহত সাহাবিদের সাহায্য করার কোনো সম্পর্ক নেই।

সুতরাং শাইখ সালাহুদ্দিন আল ইদলিবির এ যুক্তিও গ্রহণ করার মতো নয়।

ছয় নম্বর পয়েন্টে ফাতিমা (রা.) ও আয়িশা (রা.)-এর বয়সের তুলনা করে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, বিয়ের সময় আয়িশা (রা.)-এর বয়স বেশি ছিল। কিন্তু এটা মাথায় রাখা প্রয়োজন, বয়সের সংখ্যাসংক্রান্ত এসব বর্ণনা তাবেয়িদের। আর এর বিপরীতে স্বয়ং আয়িশা (রা.)-এর বর্ণনা আছে—যাতে তিনি নিজের বিয়ের বয়স উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া যুক্তিতে উল্লিখিত বর্ণনা—পবিত্র কাবা ঘর পুনর্নির্মাণের সময় ফাতিমা (রা.)-এর জন্ম হয়েছে। এর বিপরীতে আরেকটি বর্ণনা বলছে, তিনি নবুয়তের প্রথম বছরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এর ভিত্তিতে বললে আয়িশা (রা.) নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে জন্মগ্রহণ করেন; যেহেতু আয়িশা (রা.)-এর পাঁচ বছরের বড়ো হলেন ফাতিমা (রা.)। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে—তাঁর বিয়ে ছয় বছর বয়সেই হয়েছে। এখানে সবকিছু দিনের মতো পরিষ্কার।

সুতরাং এই পয়েন্টের মাধ্যমেও আয়িশা (রা.)-এর বয়স বিয়ের সময় বেশি ছিল, এটা অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায় না।

মূলত এটাই সঠিক, তাঁর বিয়ে হয়েছিল ছয় বছর বয়সে এবং একান্ত সময় কাটানো শুরু হয় নয় বছর বয়সে।

আরেকটি কথা—তিনি যদি বিয়ের সময় ১৮ বছর বয়সি হতেন, তাহলে তিনি মাক্কি জীবনের বহু ঘটনা বর্ণনা করতে একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে থাকতেন। শুধু এভাবে বলতেন যে, মক্কায় এসব ঘটেছিল। তিনি বলতেন না—'আমি খাদিজা (রা.)-কে দেখিনি।' আয়িশা (রা.) যদি বেশি বয়সের হতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই খাদিজা (রা.)-কে দেখতেন, তাঁর স্মৃতি মনে করতে পারতেন। তিনি মনে করতে পারেননি। কারণ, খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকালের সময় তিনি চার-পাঁচ বছরের শিশু ছিলেন।

তা ছাড়া তিনি যদি বিয়ের সময় ১৮ বছর বয়সি হতেন, তাহলে নবিজির সাথে বিয়ের পরও তিনি পুতুল দিয়ে খেলতেন না।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, শাইখ সালাহুদ্দিন আল ইদলিবি প্রদত্ত প্রমাণ ও যুক্তিগুলো অকাট্য নয়। আমরা তার প্রধান পয়েন্টগুলো খণ্ডন করে বুঝতে পারছি, আয়িশা (রা.)-এর বিয়ে হয়েছিল ছয় বছর বয়সে এবং একান্ত সময় কাটানো শুরু হয় নয় বছর বয়সে।

মনে রাখতে হবে, আয়িশা (রা.)-এর বিয়ের বয়স তাঁর সময়কালে এবং অতীতে সমস্যার কিছু ছিল না। কেবল বর্তমানেই এটাকে সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা না করেই।

আর আমি এটাও বলছি না, অতীতের এ ঘটনাকে কাট-পেস্ট করে বর্তমানেও তেমনটাই করতে হবে। এখন আমাদের সময়ের চাহিদার আলোকে বিয়ের ন্যূনতম বয়স নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কারণ, আমাদের যুগের নারী-পুরুষ আর অতীতের নারী-পুরুষ এক নয়। শারীরিক, জৈবিক গঠন ও বুদ্ধিমত্তা—কোনো দিক থেকেই সমান নয়। সুতরাং ইসলামি সমাজ যৌক্তিকভাবে বিয়ের ন্যূনতম বয়স প্রবর্তন করতে চাইলে এতে সমস্যা নেই।

শরিয়াহ কখনো এটা বলে না, সময়ের চাহিদার আলোকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। হারাম হলো—নবিজি তাঁর সময় ও যুগে যেসব কাজ করেছেন, সেগুলোর সমালোচনা করা। এটা কুফরি। সেগুলোকে অনৈতিক মনে করা কুফরি। তবে এটাও কেউ বলছে না, আয়িশা (রা.)-এর বিয়ের বয়সকে

আমাদের সময়ে আমদানি করে অতি অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে। আর সময় ও যুগের চাহিদার ভিত্তিতে বিয়ের বয়সসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়াতে বাধা নেই। যদি মনে হয় স্থান, কাল ও পাত্রভেদে বিয়ের ন্যূনতম বয়স বাড়ানো উচিত, আমরা তা বাড়াতে পারি।

বর্তমানে আমেরিকার অনেক অঞ্চলেই বিয়ের ন্যূনতম বিয়স ১৫-১৬ বছর। আমেরিকায় শর্তসাপেক্ষে ১২-১৩ বছর বয়সে বিয়ের অনুমোদন দেওয়া কেসের সংখ্যা সম্ভবত এক ডজনের বেশি হবে। বর্তমান যুগেই এত কম বয়সে বিয়ে হচ্ছে। আজকাল আমেরিকার মিডল স্কুল ও হাইস্কুলের বাচ্চারা তো অনেক আগেই যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে (সব ক্ষেত্রে হয় না হয়তো)।

সুতরাং কেউ যদি নবিজিকে আয়িশা (রা.)-এর বিয়ের বয়স নিয়ে দোষারোপ করে, তবে সেটা তার মূর্খতার পরিচয় বহন করে।

আয়িশা (রা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণের পরিণাম

আয়িশা (রা.) আমাদের সকল উম্মুল মুমিনিন থেকে অধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। কারণ, আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর সম্পর্কে সরাসরি আয়াত নাজিল করেছেন। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন—

> 'যে ব্যক্তি উমর (রা.) ও আবু বকর (রা.)-কে অভিশাপ দেয়, তার শাস্তি হলো তাকে বেঁধে প্রহার করতে হবে (দোররা মারতে হবে)। আর যে ব্যক্তি আয়িশা (রা.)-কে নিয়ে বাজে কথা বলবে, তার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড।'[১০৮]

লোকেরা ইমাম মালেক (রহ.)-কে প্রশ্ন করল—'আয়িশা (রা.)-এর বেলায় মৃত্যুদণ্ড কেন?' তিনি বলেন—

> 'কেননা, আল্লাহ নিজে আয়িশা (রা.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এ আয়াতটিসহ ১০টি আয়াত নাজিল করেছেন।'

অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন—

> 'আল্লাহ তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছেন আর কখনোই এ ধরনের কিছু না বলার জন্য, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।'

আর এজন্যই ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন—'যে আয়িশা (রা.)-এর ওপর অপবাদ আরোপ করবে, সে কুরআনের আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে।

---

১০৮ من سب أبا بكر وعمر جلد ومن سب عائشة قتل ، قيل له : لم يقتل في عائشة ؟ قال : لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها : (يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين

আর কোনো মুসলমান কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করলে তাঁর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।' হাম্বলি মাজহাবের বিজ্ঞ আলিম আবু ইয়ালা (রহ.) বলেন—

> 'যে আয়িশা (রা.)-এর ব্যাপারে অভিযোগ ও অপবাদ আরোপ করবে, আল্লাহ তাকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেবেন। আর সে সর্বসম্মতভাবে কাফির।'[১০৯]

সমস্ত উলামায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে—যে ব্যক্তি আয়িশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও অপবাদ দেবে, সে ইসলামের গণ্ডির বাইরে চলে যাবে। ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন—

> 'সমস্ত বিজ্ঞ আলিম একমত, যে ব্যক্তি আয়িশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ-অপবাদ দেবে, সে কাফির। সে আর মুসলমান থাকবে না।'[১১০]

অতএব, আমরা এখানে সুস্পষ্টভাবে জানতে পারছি—যে ব্যক্তি আয়িশা (রা.)-এর অমর্যাদা করবে, সে ঈমানহারা হয়ে যাবে। নবিজির সময়ের মুনাফিকরা তাঁর ব্যাপারে যেমন কুৎসা রটনা করেছিল, সেগুলোকে অবলম্বন করে তাঁকে কটাক্ষ করেছিল, ঠিক তেমনি এখন যারা তাঁকে নিয়ে কুৎসা রটাবে, সেও ঈমানহারা হয়ে যাবে। সে যে আর মুসলিম থাকবে না—এ বিষয়টি একদম স্পষ্ট।

আরেকটি গ্রুপ আছে—যাদের আমরা শিয়া বলে জানি, তারাও আয়িশা (রা.)-এর ব্যাপারে এ অপবাদ আরোপ করে না। যদিও আমাদের সুন্নিদের অনেকে বলে থাকে, শিয়ারা আয়িশা (রা.)-এর ব্যাপারে এ অপবাদ আরোপ করে। আমাদের সুন্নিদের এ অভিযোগ সত্য নয়। শিয়ারা আয়িশা (রা.)-এর ব্যাপারে ইফকের ঘটনার অপবাদ আরোপ করে না।

তাদের অন্যান্য অভিযোগ রয়েছে। আর সেগুলোর রাজনৈতিক কারণ হলো—উষ্ট্রের যুদ্ধে আলি (রা.)-এর বিরুদ্ধে আয়িশা (রা.)-এর ভূমিকা। অর্থাৎ আমি এখানে বোঝাতে চাচ্ছি, শিয়ারা মুনাফিকদের দেওয়া অপবাদকে পুঁজি করে আয়িশা (রা.)-কে অভিযুক্ত করে না। এ বিষয়টিতে

---

১০৯ قال القاضي أبو يعلى : (من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم

১১০ قال ابن القيم رحمه الله : (واتفقت الأمة على كفر قاذفها

শিয়াদের পক্ষাবলম্বন করার কারণে আবার কেউ ভাববেন না, আমি শিয়াদের অন্যান্য বিষয় মেনে নিয়েছি। আমি কেবল বলতে চাচ্ছি—তারা যা করেনি, তার অপবাদ যেন না দিই।

এটা সত্য যে, তারা আয়িশা (রা.)-কে অভিযুক্ত করে (তাদের মত এগুলো, আমার নয়) আলি (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ করার কারণে, খিলাফতের বিরোধিতা করার কারণে ইত্যাদি (তাদের অভিযোগের লম্বা তালিকা রয়েছে আয়িশা রা.-এর বিরুদ্ধে)। আয়িশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে এসব অভিযোগের জন্য তাদের আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এমন অভিযোগ করা অন্যায় ও বিদআত।

তবে এ অভিযোগগুলো কুফর নয়। কুফর হলো ইফকের ঘটনা নিয়ে আয়িশা (রা.)-কে অভিযুক্ত করা। আরেকটি বিষয় হলো—আমাদের সুন্নিদের মধ্যে যেমন কট্টর সুন্নি আলিম রয়েছে, তেমনি শিয়াদের মধ্যেও কট্টর শিয়া আলিম রয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো, লন্ডন থেকে যিনি মতামত প্রদান করে। আমি তার নাম সরাসরি নিচ্ছি না। তবে আমার নামে তার নাম। সে অত্যন্ত জঘন্য ও নোংরা ভাষায় উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.)-এর ব্যাপারে সমালোচনা করেছে, অপবাদ দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো—'আয়িশা (রা.) বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে নবিজিকে হত্যা করেছেন!' আস্তাগফিরুল্লাহ! নাউজুবিল্লাহ!

তার এমন জঘন্য নোংরা কথা প্রচারের কারণে অন্যান্য শিয়া আলিমও তাকে পথভ্রষ্ট বলেছে, তার থেকে সাধারণ শিয়াদের দূরে থাকতে বলেছেন। যারা এ লোকের ব্যাপারে সাধারণ শিয়াদের সতর্ক করেছেন, তাদের অন্যতম হলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি। তিনি আয়িশা (রা.)-এর ব্যাপারে এমন বাজে মন্তব্য করতে শিয়াদের নিষেধ করেছেন।

লেবাননের বৈরুতের শিয়া আলিম মুহাম্মাদ ফাজলাল্লাহও এ লোকটিকে এমন বক্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। তবে শিয়ারা আয়িশা (রা.)-কে পছন্দ করে না—এটা সত্য। আর তাদের এ পছন্দ না করাটা অবশ্যই মন্দ কাজ। তাদের এ মন্দ কাজের সাথে আমরা একমত নই, তবে তাদের এ কাজ কুফরের পর্যায়ে পৌছায়নি।

শেষ পর্যায়ে আমরা বলতে পারি, আয়িশা (রা.) আমাদের উম্মুল মুমিনিন। নবিজির অন্যতম সেরা প্রিয়তমা স্ত্রী। বাস্তবিক অর্থে, খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পরের সময়কালে আয়িশা (রা.) ছিলেন নবিজির সবচেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রী। আমরা তাঁদের ভালোবাসি, যাদের আল্লাহ ও তাঁর নবিজি ভালোবাসেন। যেহেতু নবিজি আয়িশা (রা.)-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, আমরাও তাঁকে আমাদের উম্মুল মুমিনিন হিসেবে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি এবং ভালোবাসি। আমরা তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দিই। আর আমাদের সমস্ত কিতাবের জ্ঞান অনুযায়ী বুঝতে পারি, আয়িশা (রা.) এই সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার হকদার।